রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ

রহস্যময় উপত্যকা

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

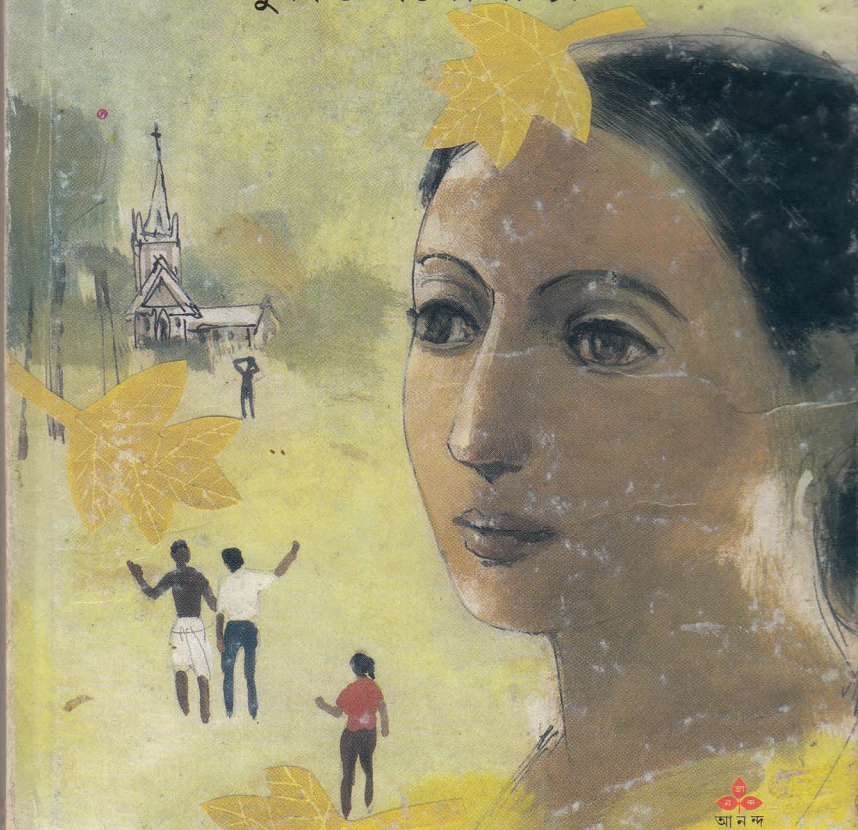

আনন্দ

রহস্যময় উপত্যকা

রহস্যময় উপত্যকা

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত চৌধুরী

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৬

© সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-555-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ শিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

৭৫.০০

রাই ও ঋক-কে
রাঙামামা

ঝিনুকের ইদানীং একটা নতুন ঝোঁক চেপেছে। খবরটা এখন পর্যন্ত কেউ জানে না। গোপনীয়তার কারণ, একটা কাজও সে এখনও কমপ্লিট করতে পারেনি। সম্পূর্ণ না করে কোন স্পর্ধায় সে ঘোষণা করবে, আমি একজন সম্ভাবনাময় ডিটেকটিভ গল্পের রাইটার! গোয়েন্দার নাম ঠিক হয়ে গেছে, আদিত্য রায়। জম্পেশ নাম।

দীপঙ্কর বাগচীর চেয়ে অনেক ভাল। চেহারাও দীপকাকুর তুলনায় অনেক হ্যান্ডসাম। সাড়ে ছ'ফুটের মতো হাইট, ফরসা টকটকে গায়ের রং। ক্লিন শেভেন। চোখে চশমার বালাই নেই। মার্শাল আর্টে ওস্তাদ। তেমনই বন্দুকের নিশানা। মানে জাস্ট অপজিট দীপকাকু। আদিত্য রায়ের সহকারী ওঁর কলেজ মেট কানাই ঘোষ। ভীষণ ভালবাসেন আদিত্যকে। শার্লক হোমসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়াটসনের মতো সমস্ত ঘটনাপঞ্জি লিখে রাখেন তিনি।

চরিত্রের কাঠামো একদম তৈরি। এই ফ্রেমে তিনটে অসমাপ্ত গল্প লিখে ফেলেছে ঝিনুক। রহস্যের জট এতটাই পাকিয়ে গেছে যে, নিজেই খুলতে পারেনি। এসব গল্প কাউকে পড়ানো যাবে না। কেউ হাসবে, কেউ বা দেবে স্তোক, সান্ত্বনা। যার কোনওটাই ঝিনুকের কাম্য নয়। ক'দিন হল খুব হতাশ লাগছে। মনে হচ্ছে এ লাইন আমার নয়।

আজ সকাল থেকে চার নম্বর গল্পটা চেষ্টা করছে ঝিনুক। মাঝে কম্পিউটার ক্লাস, ক্যারাটে ক্লাব ঘুরে এসেছে। এখন সন্ধে, পাতা ছয়েক লেখাও হয়ে গেছে গল্পটা। ভাবা রয়েছে অনেক দূর। একটু

আগে ভাবনাটা খতিয়ে দেখতে গিয়ে হোঁচট খেল প্রবল।

প্লটটা মোটামুটি এরকম, কলকাতার এক বড়লোক বনেদি বাড়ির অষ্টধাতুর একটি মূর্তি চুরি গেছে। বিষ্ণু মূর্তিটার হাইট এক ফুট, ওজন এক কেজি। এ-বাড়িতে আদিত্য রায় আগে এসেছেন, তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়র বাড়ি এটা।

বাড়ির লোক আদিত্য রায়কে তদন্তের ভার দেন। আত্মীয়র মধ্যে এত বড় ডিটেকটিভ থাকতে খামোখা পুলিশের কাছে কেন যাবেন। তদন্ত করতে গিয়ে আদিত্য রায়ের ধারণা হয়, মূর্তিটা এখনও এ-বাড়িতেই আছে, সরিয়ে ফেলা হয়নি। চোর এ-বাড়িরই কেউ। কোথায় লুকিয়েছে, সেটাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

গভীর চিন্তায় ডুবে থাকা আদিত্য দাঁড়িয়েছিলেন নাচঘরের ঝাড়বাতির নীচে। বাড়ির গা দিয়ে বয়ে গেছে হুগলি নদী। হাওয়া আসছিল এলোমেলো। ঝাড়বাতি দুলছিল রিনঠিন শব্দে। হঠাৎই কপালে ভাঁজ পড়ে আদিত্য রায়ের। এ-বাড়ির ঝাড়বাতির শব্দ তিনি আগেও শুনেছেন, আজ যেন কেমন অন্যরকম আওয়াজ।

আসলে চুরি যাওয়া মূর্তিটা লুকোনো আছে ওখানেই। সেটাই আবিষ্কার করবেন আদিত্য রায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, অত উঁচুতে ঝাড়বাতির মধ্যে জিনিসটা রাখল কে? যদি ছুড়ে দিয়ে থাকে, জিনিসটা আটকে না গিয়ে, পড়ে ভেঙে যেতে পারত। তাতে চোরের কোনও লাভ হত না। ভাবনা এখানে এসেই থেমে গেছে ঝিনুকের। এক ইঞ্চিও এগোতে পারছে না। এতটা লেখা পাতা কি শুধুই পণ্ডশ্রম?

পেনটা খাতার উপর নামিয়ে রাখে ঝিনুক। চেয়ারে ঠেস দিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। গোয়েন্দা গল্প লেখা যে এত কঠিন কাজ, আগে বুঝতে পারলে কিছুতেই চেষ্টা করত না। তাকে এ কাজে প্রবৃত্ত করেছে একজনের উপেক্ষা। তিনি এখন ড্রয়িং রুমে

বসে বাবার সঙ্গে দাবা খেলছেন। অর্থাৎ দীপকাকু। মিশরের রানির চিঠি উদ্ধারের পর থেকে তিনি আর কোনও কাজেই ঝিনুককে সহকারী করেননি। জিজ্ঞেস করলে বলেছেন, 'এখন সব আজেবাজে কাজ নিয়ে আছি। তোমার ভাল লাগবে না।'

"কী ধরনের কাজ?" জানতে চেয়েছিল ঝিনুক।

উত্তরে দীপকাকু বলেছেন, "যেমন ধরো, এক ভদ্রলোক রোজ অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন, তাঁর পাঞ্জাবির পিঠে কালি ছিটোনোর দাগ। কে যে কোথায়, অফিসে না বাসে কাজটা করছে, ধরা যাচ্ছে না। আর-একটা কেস, বরানগরে ঘোষালবাড়ির সামনে প্রত্যেক শনিবার সিঁদুর লাগানো ফুল, বেলপাতা, কাচ ভাঙা ছোট্ট আয়না পড়ে থাকতে দেখা যায়। এটা হচ্ছে তুক করা। ঘোষালবাড়ির অনিষ্ট কামনা করছে কেউ বা কারা।"

আরও কেসের কথা বলতে যাচ্ছিলেন দীপকাকু, বাবা সামনেই ছিলেন, বলে ওঠেন, "কেন এসব ফালতু কেস নাও, দর কমে যাবে তোমার। বুদ্ধিতে জং ধরে যাবে। যারা এসব কেসের অপরাধী, খুবই অল্প বুদ্ধির মানুষ। এদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া কি তোমার মতো জিনিয়াসের মানায়!"

প্রশংসাটা হজম করে দীপকাকু বলেছিলেন, "উপায় নেই দাদা, এগুলোই আমার নেট প্র্যাকটিস। নেমে পড়েছি যখন এ লাইনে, মাথাটাকে সচল রাখতে হবে, চালাতে হবে খরচও। আমি তো আর শখের ডিটেকটিভ নই।"

সত্যি বলতে কী, কেসগুলো শুনে ঝিনুকেরও খুব একটা ভক্তি জাগেনি। তবু তারও তো প্র্যাকটিস দরকার। রানির চিঠি উদ্ধারের পর কাগজ টিভিতে ঝিনুকের নাম, ফোটো সবই বেরিয়েছে, দীপকাকু ছিলেন অন্তরালে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুরা তারপর থেকে ঝিনুককে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, 'তোদের পরের এক্সপিডিশন কী?'

শুনে শুনে বোর হয়ে গিয়েছে ঝিনুক। কেন যে দীপকাকুর কাছে বড়সড় কেস আসে না, কে জানে!

না আসার যথেষ্ট কারণও আছে, যা গেটআপ! সিঁথি কাটা চুল, মোটা গ্লাসের চশমা, অ্যাভারেজ হাইট, পায়ে চটি, শার্ট ইন করেন আলেকালে। তাই তো ঝিনুক সৃষ্টি করেছে আদিত্য রায়কে। সমস্যা হচ্ছে, আদিত্য রায় যতই স্মার্ট হন, মাথার গ্রে ম্যাটারটা তো ঝিনুকের। বুদ্ধির দৌড় তাই সংক্ষিপ্ত।

দীপকাকুর উপর অভিমান করেই গোয়েন্দা গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিল ঝিনুক, একটা লেখা কমপ্লিট করে সবাইকে চমকে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। বোঝা গেল হবে না। আজকের লেখাটার জন্য আপশোস হচ্ছে, প্রায় মেরে এনেছিল।

চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে ঝিনুক, দীপকাকুর কাছেই যেতে হবে মনে হচ্ছে। একটু যদি গাইড করেন, দাঁড়িয়ে যাবে গল্পটা।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে আসে ঝিনুক। বাবা, দীপকাকু জগৎ সংসার ভুলে দাবার বোর্ডে নিমগ্ন।

ঝিনুক বাবার সোফার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বাবা হয়তো টেরই পাননি। গলা ঝেড়ে ঝিনুক বলে, "দীপকাকু, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।"

বোর্ড থেকে চোখ না তুলেই দীপকাকু বলেন, "গল্পটা কোথাও এসে আটকে গিয়েছে?"

স্বাভাবিক কারণেই চমকায় ঝিনুক। যদিও এরকম পরিস্থিতিতে দীপকাকু তাকে আগেও অনেকবার ফেলেছেন। প্রতিবারের মতো এবারেও কৌতূহলী হয় সে। জানতে চায়, "কী করে বুঝলেন?"

মাথা নিচু, দীপকাকু বলে যান, "বউদি বলছিলেন, তুমি নাকি লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে এসে ক'দিন খুব পড়াশোনা করছ, লিখছ। কাল একবার ঢুকেছিলাম তোমার ঘরে। টেবিলে দেখলাম, আর্থার

কোনাল ডয়েল, গিলবার্ট কিথ চেস্টারটন, কার্টার ডিক্‌সন, আগাথা ক্রিস্টি, একসঙ্গে এত পড়লে মাথা তো গুলিয়ে যাবেই। তা বলো, কোথায় আটকেছে গল্পটা?"

মেজাজটা পুরো বিগড়ে গেল ঝিনুকের। ইচ্ছে হচ্ছে এখনই ছুটে যায় নিজের ঘরে, ছিঁড়ে ফেলে আজ সকাল থেকে লেখা ছ'টা পাতা। পরক্ষণে মায়া জাগে নিজের লেখার উপর। আহা রে, গল্পটা প্রায় হয়ে এসেছে।

অগত্যা বড় একটা ঢোক গিলে ঝিনুক বলতে থাকে নিজের গল্প। মাঝপথে বাবা বলে ওঠেন, "দারুণ হচ্ছে, এগিয়ে যা।" দীপকাকু কোনও মন্তব্য করেন না। হোঁচটের জায়গায় এসে থামে ঝিনুক। দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "কে হতে পারে চোর, কী উপায়ে রাখবে মূর্তিটা, অত উঁচুতে ঝাড়বাতির মধ্যে?"

দীপকাকুর এক্সপ্রেশনে কোনও পরিবর্তন নেই। বোঝাই যাচ্ছে না, ঝিনুকের প্রশ্নটা শুনেছেন কিনা। চেয়ে আছেন দাবার বোর্ডের দিকে। গুটি তুলে একটা দানও দিলেন। চালটায় বাবা পড়েছেন বেকায়দায়, ভুলেই গেছেন, এইমাত্র ঝিনুক একটা গল্প বলছিল। নিজেকে কেমন যেন বোকাবোকা লাগে ঝিনুকের।

এমন সময় ডোরবেল বেজে ওঠে। নিশ্চয়ই মা। গড়িয়াহাটে শপিংয়ে গিয়েছিলেন। বাবার পাশ থেকে এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে ঝিনুক। দ্যাখে, কুরিয়ারের লোক। তার মানে বাবার চিঠি। এসময় প্রায়ই আসে। লোকটা কিছু বলার আগেই ঝিনুক বাবার উদ্দেশে বলে ওঠে, "বাবা, তোমার চিঠি।"

"তুই সই করে নিয়ে নে।" চাল দিতে দিতে বলেন বাবা।

কুরিয়ারের লোকটা বলে, "চিঠিটা আঁখি সেনের নামে..."

ভ্রু কুঁচকে যায় ঝিনুকের, তাকে কুরিয়ার করে কে চিঠি পাঠাবে! বন্ধুরা কার্ডফার্ড পাঠাতে পারে, কিন্তু এখন তো কোনও উপলক্ষ

নেই। প্রায় কুড়ি দিন হতে চলল বাংলা নববর্ষ গিয়েছে। তা ছাড়া বন্ধুরা এত খরচা করে কার্ড পাঠাবেই না।

সই করে খামটা হাতে নিয়ে ঝিনুক টের পায়, কার্ড নয়, পাতলা কোনও কাগজ। ডেলিভারিম্যান চলে গেলে, দরজা বন্ধ করে ঝিনুক। ফিরে এসে বসে সোফায়। খামটা খুলতে যাবে, দাবার বোর্ডে মন রেখে হাত বাড়ান বাবা। ঝিনুক বলে, "তোমার নয়, আমার চিঠি।"

মুখ ফেরান বাবা। অবাক গলায় বলেন, "তোকে আবার কে কুরিয়ার করে চিঠি পাঠাল?"

একটু যেন গর্ব ভরে খামটা খুলতে থাকে ঝিনুক। বেরিয়ে আসে পার্সোনাল প্যাডের পাতায় লেখা চিঠি। কাগজের মাথায় ছাপার অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা ড. বিপুল নন্দী, বায়োটেকনোলজিস্ট, অ্যাড্রেস ডোভার লেনের, আর ফোন নম্বর।

বাবা ফের জানতে চান, "কে?"

চিঠির ব্যাপারে দীপকাকুর কোনও কৌতূহল নেই, বাবাকে তাড়া দেন, "চাল দিন রজতদা।"

দাবার ধাঁধায় ডুবে যান বাবা। ঝিনুক চিঠিটা পড়তে থাকে। জীবনে এই প্রথমবার কেউ তাকে কুরিয়ারে চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠি শুরু হয়েছে এরকমভাবে—

স্নেহের আঁখি,

লেটারহেড প্যাডের উপরের লেখা পড়ে আমার পরিচয় জানলে। বয়সটা বলি, ৬২। একটা বিশেষ প্রয়োজনে দীপঙ্কর বাগচীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। মি. বাগচীর কর্মকুশলতা সম্বন্ধে জানতে পারি মিশরের রানির চিঠি উদ্ধারের খবর পড়ে। যে অভিযানে তুমিও সঙ্গে ছিলে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমি যে সমস্যায় এখন পড়েছি, একমাত্র মি. বাগচীর মতো মেধাসম্পন্ন

গভীর মনের ডিটেকটিভ আমাকে উদ্ধার করতে পারেন।

দীপঙ্করবাবুর ঠিকানা, ফোন নম্বর কোনওটাই আমার জানা নেই। যে কাগজে তোমাদের অনুসন্ধানের বিবরণ বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছিল, তাদের অফিসে ফোন করে তোমার ঠিকানা, ফোন নম্বর পাই। ফোন করতে পারতাম, যদি উড়ো ফোন ভেবে গুরুত্ব না দাও, সেই ভেবেই এই চিঠি।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মি. বাগচীকে নিয়ে আমার বাড়িতে চলে এসো। আগে একটা ফোন করে নিতে পারো। আমি বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকি। সমস্যা খুবই গুরুতর বলে জেনো। এর সঙ্গে শুধু আমি জড়িয়ে নেই, গোটা মনুষ্যকুল জড়িত।

ইতি

ড. বিপুল নন্দী

ঝিনুককে লেখা হলেও চিঠিটা আসলে দীপকাকুর। তার জন্য মোটেই খারাপ লাগে না ঝিনুকের। আশা করাই যায়, এই তদন্তে দীপকাকু তাকে সঙ্গে নেবেন।

চিঠিটা দীপকাকুর দিকে বাড়িয়ে ঝিনুক বলে, "নতুন কেস।"

কেস শব্দটা দীপকাকুর একাগ্রতায় চিড় ধরায়। কপালে ভাঁজ ফেলে ঝিনুকের হাত থেকে চিঠিটা নেন। মন দিয়ে পড়তে থাকেন। বাবা কিছুটা বিস্মিত। বলেন, "কী হল দীপঙ্কর, তুমি ওর চিঠি পড়ছ কেন?"

উত্তর না দিয়ে চিঠি পড়া শেষ করেন দীপকাকু। উলটেপালটে কাগজটা দেখেন। তারপর চিন্তায় ডুবে যান। বাবা কিছু বুঝতে না পেরে দীপকাকুর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়তে থাকেন। ঝিনুক চেয়ে আছে দীপকাকুর মুখের দিকে। পরের সিদ্ধান্তটা কী নেন, সেটাই দেখার।

বাবা বলে ওঠেন, "আরে, এ চিঠি নিয়ে এত চিন্তার কী আছে!"

"কেন এ কথা বলছেন?" জানতে চান দীপকাকু।

"ঝিনুকের বন্ধুরা প্ল্যান করে এটা পাঠিয়েছে, ওকে ঠকানোর জন্য। তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়ার পর থেকে খুব জাহির করে হয়তো নিজেকে।"

বাবার কথা পুরোপুরি ফেলে দিতে পারে না ঝিনুক, সত্যিই সে একটু হাইট নিয়ে চলে বন্ধুদের মধ্যে। হেনস্থা করার একটা চেষ্টা নিতেই পারে ওরা। শ্রবণা, রুদ্রাণী, এলা, রাহুল, অয়ন...সবার মুখ মনে পড়ে পরপর, মহাবিচ্ছু সবক'টা।

ঠোঁট উলটে দীপকাকু বলেন, "না রজতদা, এই চিঠি অরিজিনাল।"

"কী করে বুঝলে?" জানতে চান বাবা।

"হ্যান্ডরাইটিং আর চিঠির বয়ান দেখে। বয়স্ক এবং শিক্ষিত মানুষের লেখা। চিঠির ভাষাই সেটা বলে দিচ্ছে।" বলে, ঝিনুকের দিকে ফেরেন দীপকাকু। নির্দেশ দেন, "যাও, ভদ্রলোককে একটা ফোন করো।"

"ফোন করে কী বলব, কবে দেখা করছি আমরা?" জানতে চায় ঝিনুক।

দীপঙ্কর বলেন, "আগে কথা বলে দেখে নিই, সমস্যাটা ঠিক কী রকম, আদৌ আমার এক্তিয়ারের মধ্যে কিনা। তারপর দেখা করার প্রশ্ন।"

ঝিনুকদের কথোপকথনে রজতও আগ্রহী হয়েছেন। বলেন, "দ্যাখ না রিং মেরে কী বলে। সায়েন্টিস্ট মানুষ, মনে তো হচ্ছে উঁচুমানের কেস পেতে যাচ্ছে দীপঙ্কর।"

দীপকাকুর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে ঘরের কর্নারে ফোনস্ট্যান্ডের সামনে যায় ঝিনুক। চিঠিতে লেখা নম্বরে ডায়াল করে। ও প্রান্তে রিং হচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে। কেউ ধরছে না। একসময় থেমে গেল রিং।

দীপকাকু বললেন, "ধরছে না?"

মাথা নাড়ে ঝিনুক।

"আবার করো।" বলেন দীপকাকু।

দ্বিতীয়বারও কেউ ধরল না। ঝিনুক খানিকটা হতাশ। দীপকাকু বলেন, "চিঠিতে লিখছেন সবসময় বাড়িতে থাকি, এখন কেন নেই?"

"ওটা কথার কথা। গিয়েছেন হয়তো আশপাশের দোকানে অথবা বাথরুমেও থাকতে পারেন।" বলে দাবার বোর্ডে মনোনিবেশ করেন রজত। ঝিনুক দ্যাখে, দীপকাকুও গিয়ে বসছেন খেলায়। আবার কতক্ষণ পর বিপুল নন্দীকে ফোন করা হবে ঠিক করা হল না। মনটা ছটফট করে ঝিনুকের। অস্থিরতা কাটাতে ঝিনুক ফিরে যায় নিজের গল্পের সমস্যায়। ছোট্ট করে কেশে নিয়ে দীপকাকুর উদ্দেশে বলে, "তা হলে আমার ব্যাপারটা কী হল? কে হতে পারে..."

কথা শেষ হওয়ার আগেই দীপকাকু বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন, "ডিটেকটিভ গল্প লেখার মতো সহজ কাজ খুব কম আছে। অপরাধ, ক্লু, অপরাধী সবই তার হাতে। মাঝে শুধু কিছুটা ধাঁধা তৈরি করতে হয়। তুমি সেটা আগেই করে ফেলেছ। খুবই ইনোসেন্ট রাইটারের লক্ষণ এটা।"

এটা যে প্রশংসা নয়, ভালভাবেই টের পায় ঝিনুক। দীপকাকুর গোঁফের আড়ালে লুকিয়ে আছে মিচকে হাসি। গল্পের স্বার্থে বিদ্রুপটা অগ্রাহ্য করে ঝিনুক বলে, "বলুন না একটা সলিউশন।"

চাল দিতে দিতে দীপকাকু বলতে থাকেন, "প্রাচীন আমলের বাড়ি। ঝাড়বাতি যখন আছে, অন্যান্য ল্যাম্পশেড থাকার কথা। বাড়ির একটি চাকর এক সপ্তাহ অথবা পনেরো দিন অন্তর ঘড়াঞ্চিতে উঠে বাতিদানগুলো পরিষ্কার করে। দোষটা তার ঘাড়েই চাপিয়ে

দাও। ঘড়াঞ্চি জিনিসটা কী, জানো তো? সিঁড়ি উইথ স্ট্যান্ড।"

ঘড়াঞ্চি বস্তুটা চেনে ঝিনুক। ইলেকট্রিশিয়ানরা ব্যবহার করে। গল্পের সমস্যাটা এত অনায়াসে সমাধান হয়ে যাবে, আশা করেনি ঝিনুক। এখন তার উৎফুল্ল হওয়ার কথা। হচ্ছে না মোটেই। গল্পটা আর নিজের বলে মানতে ইচ্ছে করছে না। আজ সকাল থেকে লেখা পাতাগুলো ফেলেই দেবে ঝিনুক।

কুরিয়ারে আসা চিঠি ফের পড়তে শুরু করে ঝিনুক, কাগজে ভেসে ওঠে আর্ত অসহায় এক বিজ্ঞানীর মুখ। নিশ্চয়ই গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে এই কেসে। যার পুরোটাই অজানা, ঝিনুকের গল্পের মতো বানানো নয়।

"আর-একবার ট্রাই করো তো নম্বরটা।" বললেন দীপকাকু। তার মানে খেলায় মন নেই, চিঠিটা নিয়ে উনিও উদগ্রীব।

ঝিনুক উঠে গিয়ে ফের ডায়াল করে, সেই একই ব্যাপার, রিং হয়েই যাচ্ছে। বারতিনেক রি-ডায়াল টিপেও লাভ হল না। হতাশ ভঙ্গিতে ঝিনুক ফিরে আসছে, সোফা ছেড়ে উঠে পড়েন দীপকাকু। বাবাকে বলেন, "রজতদা, বোর্ডের যা সিচুয়েশন, আপনি প্রায় জিতেই গেছেন। আমি বরং ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে ঘুরেই আসি।"

ঝিনুক চট করে একবার দাবার বোর্ডে চোখ বুলিয়ে নেয়, দীপকাকু মিথ্যে অজুহাত দিচ্ছেন। খেলা ওঁর অনুকূলে। বাবা অবাক গলায় বলে ওঠেন, "তুমি তো আশ্চর্য হ্যাংলা গোয়েন্দা, দীপঙ্কর। ভদ্রলোক লিখেছেন ফোন করে আসতে, আগ বাড়িয়ে পৌঁছে যাবে! তা ছাড়া চিঠিটা যে সত্যিকারের, সেটা তোমার ধারণামাত্র। ভুলও তো হতে পারে।"

"চিঠিটা হয়তো ফল্‌স, তবু বিষয়টা একবার খতিয়ে দেখা উচিত। কারণ, চিঠির শেষ কথাগুলো খুবই সিরিয়াস, 'সমস্যার সঙ্গে শুধু আমি জড়িয়ে নেই, গোটা মনুষ্যকুল জড়িত।' যদি সত্যিই তাই

হয়!" বলে হঠাৎ দরজার দিকে ঘুরে গেলেন দীপককাকু। ভূতগ্রস্তের মতো ছিটকিনি খুলে বেরিয়েও গেলেন।

রজত হতভম্ব হয়ে তাকান মেয়ের দিকে। ঝিনুক হাত তুলে বাবাকে আশ্বস্ত করে। মুখে বলে, "এখনই ফিরে আসবেন। ততক্ষণ ড্রেসটা চেঞ্জ করে নিই। আমাকেও তো যেতে হবে দীপকাকুর সঙ্গে।"

"কী করে বুঝলি, ফিরে আসবে?" জানতে চান রজত।

নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সবজান্তা ভঙ্গিতে ঝিনুক বলে, "বুঝলাম।"

ঘরে এসে জিনস্, টপ পরতে না-পরতেই ঝিনুক শুনতে পেল ডোরবেলের আওয়াজ। তারপরই দীপকাকুর গলা, "রজতদা, চিঠিটা কোথায় রেখে গেলাম। চিঠি ছাড়া তো ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কথাই বলবেন না।"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ব্রাশ করতে করতে হাসে ঝিনুক। মনেমনে বলে, 'এত ভুলো মন নিয়ে কী করে যে জটিল সব সমস্যার সমাধান করেন, কে জানে!'

চিঠিটা রয়ে গিয়েছিল ঝিনুকের কাছে। হাতে নিয়ে ড্রয়িংয়ে আসে সে। চিঠিটা দেখিয়ে দীপকাকুকে বলে, "এটা আমাকে অ্যাড্রেস করে লেখা, তাই আমিও যাব আপনার সঙ্গে।"

দীপকাকু আর না করতে পারেন না। বাবা বলেন, "হ্যাঁরে, তোর মা এলে কী বলব?"

"বলে দিয়ো কাছাকাছি কোথাও গেছি!"

"বন্ধুর বাড়ি?"

"তুমি যেমন ভাল বুঝবে বলে দিয়ো।"

বলে দীপকাকুর সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঝিনুক। বাবা বলেন, "গাড়িটা নিয়ে তোর মা ফিরুক। তারপর না হয় তোরা গাড়িতেই যা।"

"তোমার মাথা খারাপ? মাকে বুঝিয়ে রাজি করাতেই রাত কাবার হয়ে যাবে।"

বাড়ির বাইরে এসে ট্যাক্সি নিলেন দীপকাকু। রাস্তায় এখন গিজগিজ করছে গাড়ি। অফিস ছুটির টাইম। মুর অ্যাভিনিউ থেকে ডোভার লেন কমপক্ষে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে। ট্রাফিক স্মুথ থাকলে কুড়ি মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। দেরি নিয়ে ঝিনুকের কোনও মাথাব্যথা নেই। বাবা ঠিকঠাক মাকে ম্যানেজ দিতে পারলেই হল। ঝিনুকের এখন আপশোস হচ্ছে, খামোখা কাছাকাছি কথাটা বলতে বলল বাবাকে। 'বন্ধুর বাড়ি' কথাটাতেও না করেনি। বাবা যদি সবচেয়ে কাছের বন্ধু শ্রবণার বাড়ির নাম করে দেন, মা তক্ষুনি ফোন করবেন। ডিটেকটিভের অ্যাসিস্ট্যান্টের এই মিস্টেকটা করা উচিত হয়নি।

আড়চোখে দীপকাকুর দিকে তাকায় ঝিনুক, গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। কেসটা না জেনেই এত চিন্তা কীসের কে জানে!

বুকপকেট থেকে মোবাইল বের করলেন দীপকাকু। নম্বর টিপতে থাকলেন। ঝিনুক আন্দাজ করতে পারে। আবার একবার ফোন করা হচ্ছে ভদ্রলোককে।

ঝিনুকের আন্দাজ মিলল না। দীপকাকু কানে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, "বাপ্পা, দীপঙ্কর বলছি।"

.....

"বায়োটেকনোলজির উপর রিসেন্ট কী কী ব্যাপারে রিসার্চ হচ্ছে বলতে পারিস?"

.....

"ঠিক আছে। আপাতত আমার কাজ চলে যাবে। তুই রাতে একবার ইন্টারনেটটা সার্ফ করে রাখিস তো। আমি কাল সকালে তোকে একটা ফোন করব।"

অপর প্রান্তের কোনও কথা শুনতে পেল না ঝিনুক। এটুকু বুঝতে পারল, দীপকাকু হোমওয়ার্ক করতে শুরু করে দিয়েছেন। ড. বিপুল নন্দী বায়োটেকনোলজিস্ট, বিষয়টার লেটেস্ট পজিশন জেনে না নিলে চলবে কেন! বায়োটেকনোলজি নিয়ে ঝিনুকের ধারণা খুবই সীমিত। সে যতটুকু জানে, তা হচ্ছে, জীবকোষ নিয়ে নানা কারিকুরি করাই জৈবপ্রযুক্তির কাজ। চাহিদামতো ফল ফুল ফলানো। মানুষের দেহকোষের জিন বিশ্লেষণ করে, রদবদল ঘটিয়ে রোগ প্রতিহত করা, এরকম বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে পৃথিবী জুড়ে। এসব ভারী ব্যাপারে ঝিনুকের কোনও ইন্টারেস্ট নেই। তার একটাই চাওয়া, কেসটা যেন বেশ রোমহর্ষক হয়।

যতটা সময় লাগবে ভেবেছিল, লাগেনি। বাসন্তী দেবী কলেজের পাশের গলি দিয়ে ঝিনুকদের ট্যাক্সি ঢুকে পড়েছে ডোভার লেনে। আশপাশের বাড়ির নম্বর পড়ে বোঝা যাচ্ছে, ড. নন্দীর বাড়ি গলির শেষ প্রান্তে। একটা সিগারেট গুমটিতে জিজ্ঞেস করা হল উনিশ বাই এ বাড়িটা কোথায়? দোকানদার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

দোতলা বাড়িটা বেশ পুরনো, তবে ওয়েল মেন্টেন্ড। ফুটপাথের উপর একটা ঝাঁকড়া গাছ। তার আড়ালে সদর দরজা। সন্ধের আলো আর ল্যাম্পপোস্টটা দূরে বলে কী গাছ বোঝা যাচ্ছে না। বাড়ির সামনেটায় একরাশ নির্জনতা থম মেরে আছে।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন দীপকাকু। গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন দরজার সামনে। ঝিনুকও পাশে এসে দাঁড়াল। দরজার উপর টিনের প্লেটে শুধু বাড়ির নম্বরটাই লেখা, কারও নাম লেখা নেই। চাপা গলায় দীপকাকু বললেন, "ভদ্রলোকের কোনও আত্মগরিমা নেই অথবা বাড়িতে ওঁর পজিশন খুব একটা ভাল নয়। এরকম একজন জ্ঞানী-গুণী মানুষের নেমপ্লেট অবশ্যই দরজায় থাকত।"

ডোরবেলে হাত রাখলেন দীপকাকু। বাড়ির ভিতর বেজে উঠল শব্দ। প্রত্যুত্তরে ভেসে এল টিয়াপাখির ট্যাঁ ট্যাঁ। ডেকেই যাচ্ছে পাখিটা, একটু পরে দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে ফরসা গোলগাল বছর পঁয়ত্রিশের একটা লোক। জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন?"

"এটা কি ড. বিপুল নন্দীর বাড়ি?" জানতে চাইলেন দীপকাকু!

"হ্যাঁ।"

"উনি বাড়ি আছেন? আমরা একটু দেখা করতে চাই।"

ভদ্রলোক কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ঝিনুকদের দিকে। একটু পরে বলেন, "কেন দেখা করতে চান?"

প্রশ্নটার ধরন জেরার মতো। দীপকাকুর আচরণে অপ্রস্তুত ভাব। ঝিনুকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে বললেন, "প্রয়োজনটা কি আপনাকে বলতেই হবে? ডক্টর নন্দীকে বলা যাবে না?"

হঠাৎই হাবভাব বদলে গেল ভদ্রলোকের। একটু যেন তড়িঘড়ি করে বললেন, "আপনারা আসুন না, ভিতরে এসে বসুন।"

ঝিনুকরা ভদ্রলোককে অনুসরণ করে। ভিতরে বাড়ির টিয়াটা যেন বলে ওঠে, "কে এল রে, কে এল রে নাড়ু... " উচ্চারণ মোটামুটি স্পষ্ট।

সদরের পর গলি। বাঁ দিকের প্রথম ঘরটায় ঢুকলেন ভদ্রলোক। এটাই ড্রয়িংরুম। পুরনো বাড়ির সঙ্গে মানানসই করে সোফাসেট, অন্যান্য আসবাব। ঝিনুকদের বসতে বলে, ভদ্রলোক বসলেন সোফায়। চোখে-মুখে কেমন যেন সংশয়-মেশানো অস্থিরভাব। বললেন, "ডক্টর নন্দী আমার বাবা। আপনারা কি আগে কখনও এসেছেন মানে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় আছে?"

প্রশ্নটা কেন করা হচ্ছে বুঝতে পারছেন না দীপকাকু, মাথা নেড়ে বললেন, "পরিচয় নেই। আজই প্রথম আসছি। উনি আমাদের আর্জেন্ট চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

ভদ্রলোক সামান্য অবাক হয়ে বলেন, "বাবা চিঠি পাঠিয়েছেন, কাকে দিয়ে? কবেকার লেখা?"

"পরশুর ড়েট দেওয়া। কুরিয়ার করে পাঠিয়েছেন।"

অবাক ভাব কমল। ডক্টর নন্দীর ছেলে বললেন, "ও, তা চিঠিটা একবার দেখতে পারি কি?"

"অফকোর্স।" বলে বুকপকেট থেকে খামসুদ্ধু চিঠি বের করে ভদ্রলোকের হাতে দিলেন দীপকাকু। খাম থেকে চিঠি বের করে পড়তে থাকলেন ডক্টর নন্দীর ছেলে। কপালে তৈরি হল অজস্র ভাঁজ। পড়া শেষ করে দীপকাকুর দিকে বিষম বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। বললেন, "আপনি ডিটেকটিভ! বাবা গোয়েন্দা ডেকে পাঠিয়েছিলেন!"

ঝিনুক বুঝতে পারে না ভদ্রলোকের কোন ব্যাপারটা মানতে অসুবিধে হচ্ছে। দীপকাকুকে গোয়েন্দা বলে, নাকি বাবার চিঠিটা?

নিজের পরিচয় সুনিশ্চিত করতেই বোধহয় পকেট থেকে পার্সোনাল কার্ড বের করে ভদ্রলোককে দিলেন দীপকাকু। তারপর সন্দিগ্ধ স্বরে জানতে চাইলেন, "আপনি 'ডেকে পাঠিয়েছিলেন' বললেন কেন? আপনার বাবা কি কোথাও গেছেন? আউট অফ স্টেশন?"

"বাবা নিরুদ্দেশ হয়েছেন।" বলে ডক্টর নন্দীর ছেলে চিঠিটা ফেরত দিলেন দীপকাকুকে।

ঝিনুকের মাথা টাল খেয়ে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "কবে?"

"আজ ভোরবেলা। মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে আর ফেরেননি।"

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে দীপকাকু জানতে চাইলেন, "নিরুদ্দেশ মানে কি স্বেচ্ছায়?"

"হ্যাঁ।"

"কী করে বুঝলেন?"

"একটা চিঠি রেখে গিয়েছেন।"

ক্ষণিক নীরবতা নেমে এল ঘরে। ঝিনুকের মন খারাপ। যদি বা একটা ভদ্রস্থ কেসের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, যিনি তদন্তের ভাব দেবেন, তিনি নিজেই উধাও! একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছে ঝিনুক, ডক্টর নন্দী যদি বাড়ি ছেড়ে চলেই যাবেন, ডেকে পাঠালেন কেন দীপকাকুকে? ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে মনে হচ্ছে।

দীপকাকু হঠাৎ বলে ওঠেন, "চিঠিটা একবার দেখাতে পারেন?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনারা বসুন, আমি এখনই নিয়ে আসছি।" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ডক্টর নন্দীর ছেলে।

ভীষণ গম্ভীর হয়ে দীপকাকু ঘরের চারপাশে চোখ বোলাচ্ছেন। ঝিনুকের মাথায় অনেক সম্ভাবনার কথা এলেও বলতে পারছে না। পাছে দীপকাকু বিরক্ত হন। নাকের ডগা দিয়ে কেসটা উড়ে গেল, মেজাজ নিশ্চয়ই ভাল নেই।

ট্রে-তে তিনটে ধোঁয়া ওঠা কাপ নিয়ে ঘরে ঢোকে কাজের লোক। ভিতর বাড়িতে টিয়াটা আবার চেঁচামেচি শুরু করেছে, কী বলছে, এখন আর ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

কাজের লোক ট্রে থেকে কাপগুলো নামিয়ে রাখল সেন্টার টেবিলে।

ঝিনুক বলে, "আমি কিন্তু চা খাই না।"

লোকটা কেমন যেন এক্সপ্রেশনলেস, ঝিনুকের দিকে একবার তাকিয়ে একটা কাপ তুলে নেয় ট্রে-তে। এগিয়ে যাচ্ছিল দরজার দিকে। দীপকাকু ডাকেন, "এই শোনো।"

লোকটা ঘুরে দাঁড়ায়। দীপকাকু বলেন, "তোমাদের পাখিটা তো খুব কথা বলে! কী পাখি এটা?"

"চন্দনা।" জবাব দেয় লোকটা।

"পাখিটা কী যেন একটা বলছে। লালু বা নাড়ু, কার যেন নাম ধরে ডাকছে।"

কাজের লোকটি এবার হাসে। বলে, "ডাকছে লালুকে।"

"কে লালু?" জানতে চান দীপকাকু।

"বড়বাবুর কাজের লোক। পাখিটাকে খুব ভালবাসত। লালু চলে যাওয়ার পর থেকে পাখিটা বেশি ছটফট করছে।"

দীপকাকু বলেন, "বড়বাবু মানে, তুমি বোধহয় ডক্টর নন্দীর কথা বলছ।"

"হ্যাঁ।"

"তাঁর আলাদা কাজের লোক!" কথাটা যেন নিজেকেই বললেন দীপকাকু। প্রায় নিশ্চিত হয়ে পরের কথাটা তুললেন, "বাবুর ফোনের লাইন নিশ্চয়ই আলাদা, আমরা ঘণ্টাখানেক আগে ফোন করেছিলাম। কেউ তুলল না। বড়বাবুর ঘরটা কি খুব দূরে?"

"না তো, বাবুর ঘরে ফোন বাজলে দিব্যি শোনা যায়। আমরা ফোনের আওয়াজ পাইনি।" বলল লোকটা।

দীপকাকু প্রসঙ্গ পালটান, "লালু গেল কোথায়?"

"দেশের বাড়ি।"

দীপকাকু পরের প্রশ্নে যাবেন, পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর নন্দীর ছেলে। চিঠিটা আনতে একটু যেন বেশিই সময় নিলেন। কাজের লোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সোফায় বসে দীপকাকুর দিকে একটা চিরকুট এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। লাইন টানা ছোট নোটবুকের পাতায় লেখা চিঠি। একবার চোখ বুলিয়ে দীপকাকু খুললেন ডক্টর নন্দীর কুরিয়ারে পাঠানো

চিঠি। দুটো পাশাপাশি নিয়ে নিজের মোটা চশমায় প্রায় ঠেকিয়ে ফেলেছেন। ঝিনুক বুঝতে পারছে এত খুঁটিয়ে কী দেখছেন দীপকাকু, হাতের লেখা দুটো এক কিনা?

নিশ্চিত হয়ে দীপকাকু চিরকুটটা চালান করলেন ঝিনুকের হাতে। ডক্টর নন্দীর ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, "নোটটা কোথায় রাখা ছিল?"

"টেবিলের উপর পেপারওয়েট চাপা দেওয়া।" বললেন ভদ্রলোক।

একনিমেষে নোটটা পড়ে নিয়েছে ঝিনুক—

'চললাম। পাহাড়ের ওপারে। যেখানে সর্বদা দিন। অপেক্ষা করছেন তিনি। জরা-ব্যাধি নিয়ে আর কোনও কষ্ট থাকবে না।'

এই ক'টা লাইনের মাঝে অনেক অক্ষর পেন দিয়ে গোল পাকানো। শেষের দুটো লাইন তো পুরোপুরি কাটা। চিঠিটা কেমন যেন অসম্পূর্ণ, বেখাপ্পা লাগে ঝিনুকের। দীপকাকু ঠিক সেই কথাটাই তুললেন, "আচ্ছা মি. নন্দী, আপনার বাবার চিঠিটা কি একটু অসংলগ্ন নয়?"

নীচের ঠোঁট উলটে কী একটু ভেবে নিলেন ভদ্রলোক। বললেন, "কথাটা আপনি ভুল বলেননি। বাবার কথাবার্তা কখনওই এতটা এলোমেলো ছিল না। হাতের লেখা এক হলেও, কথাগুলো যেন অন্য কারও। আমার একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে।"

"কী ব্যাপারে?" চায়ে চুমুক দিতে দিতে জানতে চান দীপকাকু।

বিষয়টা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ সুর পালটে বলতে শুরু করলেন, "দেখুন মি. বাগচী, আমার বাবা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমি নই। আমরা ইতিমধ্যেই থানায় মিসিং ডায়েরি করেছি। পুলিশ খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে। আমি আর এ-ব্যাপারে অন্য কারও সাহায্য নিতে চাই না।"

এ তো প্রায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হল। ঝিনুকের খুবই অপমানিত লাগে। দীপকাকুর তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। ঠান্ডা গলায় বলতে শুরু করেন, "আপনার বাবা বিপদে পড়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর অনুপস্থিতি দেখে আমি কাজ বন্ধ রাখতে পারি না। বিশেষ করে যখন ওঁর নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনায় আমি অনেক অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছি।"

কথা বলতে বলতে সেলফোন বের করে ডায়াল করেছেন দীপকাকু। ফোন কানে দিয়ে বলেন, "হ্যালো, লালবাজার কন্ট্রোল? ইনস্পেক্টর রঞ্জন দত্তকে দিন না।" বলে একটু চুপ থাকলেন দীপকাকু। ডক্টর নন্দীর ছেলের মুখের ভাব নরম হচ্ছে। রঞ্জনকাকুকে চেনে ঝিনুক! আগের কেসে খুব হেল্প করেছিলেন। রঞ্জনকাকু ধরলেন মনে হয়, দীপকাকু বলছেন, "দীপঙ্কর বলছি, ডোভার লেনে একটা ইনভেস্টিগেশনে এসেছি। বালিগঞ্জ থানার ও সি-কে বলে রাখিস তো। দেখা করতে হতে পারে।"

অপর প্রান্তের কথা শুনতে শুনতে দীপকাকু ইশারায় ডক্টর নন্দীর ছেলেকে বলেন, "কথা বলবেন?"

ত্রস্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন ভদ্রলোক, দীপকাকু ফোন অফ করেন। ডক্টর নন্দীর ছেলে মোলায়েম গলায় বলতে থাকেন, "কিছু মনে করবেন না মি. বাগচী। আমার মনের অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে বাবা আর ফিরলেন না। তারপর এই চিঠি। সকাল থেকে থানা, ফোন, পুলিশ করে বেড়াচ্ছি। আপনারা এসে আরও জটিল করে দিলেন পরিস্থিতি। বলছেন, বাবা আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন... এরপর কি আর মাথা ঠান্ডা রাখা যায়!"

সঙ্গে সঙ্গে মুড বদলে ফেললেন দীপকাকু, পরম শুভানুধ্যায়ীর মতো বলতে থাকেন, "মাথা আপনাকে ঠান্ডা রাখতেই হবে। ছেলে

হিসেবে আপনারই দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। বাই দ্য ওয়ে, আপনি কি এক ছেলে? আর কোনও ভাইবোন?"

"আমার পরে একটা ভাই আছে। কালই টুরে গিয়েছে শিলিগুড়ি। ফোনে যোগাযোগ করেছি। আগামীকাল সকালের ফ্লাইটে এসে যাবে।"

"ভাইয়ের নাম?"

"অম্লান।" বলেই জিভ কাটলেন ভদ্রলোক, "সরি, এতক্ষণ নানারকম কথায় নিজের নামটাই বলা হয়নি, আমি হচ্ছি অমিতেশ।"

ঝিনুক একটা ছোট্ট নোটবুক, পেন, সঙ্গে এনেছে। আগের কেসে এ দুটোর প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিল। নোটবুকে পয়েন্ট লিখতে শুরু করে দিয়েছে ঝিনুক। দীপকাকু পরের প্রশ্নে যান, "আপনাদের পেশা?"

"অম্লান একটা ওষুধ কোম্পানির সেল্‌স ম্যানেজার। আমি ব্যাঙ্কে আছি।"

"আপনারা দুই ভাই কি ফ্যামিলি নিয়ে এই বাড়িতেই থাকেন?"

"হ্যাঁ।"

"এ বাড়িটা শুধু আপনাদের? আর কোনও অংশীদার নেই তো?"

"না।"

"এবার আপনার বাবার পড়াশোনা এবং গবেষণার ব্যাপারে বলুন।"

"বছরদুয়েক হল গবেষণা ছেড়ে দিয়েছেন বাবা। কলকাতার এক বায়োটেকনোলজি ইনস্টিটিউটের অধীনে রিসার্চ করতেন। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ফার্মাসি নিয়ে পড়াশোনা করার পর বায়োটেকনোলজি পড়েছিলেন নিউ ইয়র্কের কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে। কোর্স কমপ্লিট করার পর ফিরে আসেন দেশে,

কলকাতার ইনস্টিটিউটে জয়েন করেন।"

"আর কখনও বিদেশ গিয়েছেন?"

"না।"

"বাড়িতে অবসর সময়টা কীভাবে কাটাতেন?"

"বই পড়া, ইন্টারনেট সার্ফ করা, এ-পাড়া ও-পাড়া হেঁটে চলে বেড়ানো। বাগান করা। কখনও সখনও বন্ধুদের বাড়িতে যাওয়া। প্রকৃত অবসর যাপন বলতে যা বোঝায় আর কী!"

একটু সময় নিয়ে ভ্রু কুঁচকে দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "গবেষণার সঙ্গে আর কোনওভাবেই যোগ ছিল না?"

"নাঃ, সত্যি বলতে কী, রিসার্চটা বাবা চাকরির মতোই করতেন। ইনস্টিটিউট থেকে রিটায়ারমেন্টের পর ও ব্যাপারে আর মাথা ঘামাননি।"

থাইয়ের উপর নোটবুক রেখে সমস্ত ইনফর্মেশন ছোট করে নোট করে নিচ্ছে ঝিনুক। হঠাৎ চোখ তুলে দেখে, দীপকাকু তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। মুখ ঘুরিয়ে নেন, অমিতেশবাবুকে বলেন, "আপনার বাবার ঘরটা কি একবার দেখতে পারি?"

"চলুন।" খুবই অনিচ্ছের সঙ্গে বলেন অমিতেশবাবু।

ড্রয়িং থেকে বেরিয়ে বিশাল ডাইনিং। এখানে এসে বাড়ির অন্য সদস্যদের দেখা গেল। কিছুটা সন্ত্রস্ত এবং চাপা কৌতূহলে সবাই ঝিনুকদের দেখছে। দু'জন ভদ্রমহিলা, সম্ভবত বিপুল নন্দীর দুই পুত্রবধূ। ঝিনুকের বয়সি একটি মেয়ে, তার চেয়ে ছোট একটি ছেলে। এরা নিশ্চয়ই নাতি-নাতনি। আর সেই কাজের লোক।

ঘরের আসবাব থেকে শুরু করে সবার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে দীপকাকু অনুসরণ করলেন অমিতেশবাবুকে।

ডাইনিং পেরিয়ে লম্বা একফালি বারান্দায় এসে পড়ল ঝিনুকরা। অমিতেশবাবুর উদ্দেশে দীপকাকু বললেন, "আপনার মাকে তো

দেখলাম না!"

"মা বছরপাঁচেক হল মারা গিয়েছেন।"

"ও, আই অ্যাম সরি।" বলে দীপকাকু হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। চোখ বারান্দা-লাগোয়া আবছা অন্ধকার বাগানের দিকে। বারান্দার কম ওয়াটের আলোয় যতটুকু সম্ভব আলোকিত হয়ে আছে গাছপালা। ঝিনুকের প্রথমে চোখেই পড়েনি বাগানটা। এখানে এসে বাড়ির আবহাওয়াটাই যেন পালটে গেল। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এতটা জমি নিয়ে এই বাড়ি।

পকেট থেকে টর্চ বার করে গাছপালার উপর আলো ফেললেন দীপকাকু। বড় গাছ তেমন নেই। ম্যাক্সিমাম হাইট পাঁচ ফুট।

দীপকাকু বললেন, "অনেক ধরনের গাছ আছে দেখছি, নিয়মিত পরিচর্যাও হয়।"

"হ্যাঁ, বাবার শখ।" বললেন অমিতেশ।

"এই শখটা কি অবসর জীবনের, না আগেও ছিল?" জানতে চেয়ে টর্চ অফ করলেন দীপকাকু। প্রশ্নটা ঠিক কেন করা হল, বুঝল না ঝিনুক। অমিতেশবাবু উত্তর দিলেন, "আগে শখ থাকলেও সময় পেতেন না। ইদানীং বাগান নিয়ে খুব মেতেছিলেন।"

"নিজের হাতেই সব কাজ করতেন?"

"না, বাবার খাস কাজের লোক লালু বাবাকে হেল্‌প করত। সেও তো চারদিন হল কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।" তথ্যটা যেহেতু জানা, দীপকাকু নীরব থেকে হাঁটতে লাগলেন। বারান্দার একদম শেষে একতলা ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালেন অমিতেশবাবু। এটাই তাঁর বাবার মানে ডক্টর বিপুল নন্দীর ঘর। দরজায় তালা মারা। অমিতেশবাবু পকেট থেকে চাবি বের করে খুললেন। পাল্লা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে যাবেন, বাধা দিলেন দীপকাকু। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘরের অন্ধকার মেঝেয় টর্চের আলো ফেললেন। ঝিনুক টের পাচ্ছে,

তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির বাকি সদস্যরা।

টর্চ নিভিয়ে দীপকাকু বললেন, "মেঝেয় অনেকের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে, ডক্টর নন্দী নিরুদ্দেশ হওয়ার পর আপনারা কি ওঁকে ঘরের মধ্যেই খুঁজছিলেন?"

খুবই শ্লেষমিশ্রিত প্রশ্ন, বারান্দার ঝিমোনো আলোয় অমিতেশবাবুর মুখটা বড়ই ফ্যাকাশে দেখাল।

দীপকাকুর পরবর্তী নির্দেশ, "যান, এবার ঘরের আলো জ্বালুন।"

ঘরে ঢুকে লাইট জ্বালালেন অমিতেশবাবু। সামান্য অগোছালো ঘর। মনে হচ্ছে ডক্টর নন্দী কিছু সময়ের জন্য বাইরে গেছেন, এখনই ফিরে আসবেন।

ঘরটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, কী নেই এখানে! চেয়ার-টেবিল, কম্পিউটার-ডেস্ক, র‍্যাক ভরতি বই, ছোট স্টিল-আলমারি। এমনকী, ঘরের কোণে টেবিলের উপর একটা হিটার এবং চায়ের সরঞ্জামও দেখা গেল।

দীপকাকুর চোখ সিঙ্গল বেডের উপর স্থির, দৃষ্টি অনুসরণ করে ঝিনুক দেখতে পায়, বিছানার উপর ফোনসেট। অস্ফুটে দীপকাকু বলেন, "আমাদের করা ফোনের আওয়াজ এই জন্যই বাড়ির লোক শুনতে পাননি।"

জিনস্-এর পকেট থেকে ফের নোটবুক বের করে ফেলেছে ঝিনুক। দীপকাকু চলে গিয়েছেন চা তৈরির টেবিলের সামনে। হিটারটা অন, অফ করে দেখে নিলেন চালু আছে। চায়ের আনুষঙ্গিক কৌটোগুলো পরীক্ষা করলেন। তারপর এলেন বইয়ের র‍্যাকের কাছে। বেশিরভাগ বই বায়োটেকনোলজির উপর। দু'-চারটে বই বের করে, উলটেপালটে দেখে রেখে দিলেন।

কম্পিউটার চালু করার চেষ্টা করলেন দীপকাকু, অন হল, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু করা গেল না। পাস ওয়ার্ডে এন্ট্রি নিতে হবে।

ডক্টর নন্দী ছাড়া সেটা নিশ্চয়ই আর কারও জানা নেই।

রিডিং টেবিলে গিয়ে পকেট থেকে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বের করলেন, কাগজপত্তর চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করছেন। দীপকাকুর তদন্তের এই পর্যায়টা ভীষণ বোরিং। আবার এটাও ঠিক, এই সামান্য জিনিসগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে রহস্যের অনেক সূত্র।

টেবিলের ড্রয়ার খুলেছেন দীপকাকু। বেরোল ট্যাবলেটের ফয়েল, গোটাকয়েক পেন, খাম, পোস্টকার্ড, জোয়ানের শিশি। আতশকাচ পকেটে রেখে টেবিল থেকে তুলে নিলেন পেপারওয়েট, পেনস্ট্যান্ডের সঙ্গে ডেটচেঞ্জিং ক্যালেন্ডার। ঝিনুক লক্ষ করে, ডেটটা কালকের রয়ে গেছে, পালটানো হয়নি। টেবিলক্লকটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছেন দীপকাকু, দম দেওয়া পুরনো দিনের ঘড়ি। অমিতেশবাবুর উদ্দেশে বললেন, "আপনার বাবা মর্নিংওয়াকে ক'টায় বেরোতেন?"

"সকাল ছ'টা নাগাদ।" বললেন অমিতেশবাবু। বইপত্তরের আড়ালে থাকা অ্যাশট্রে বের করলেন দীপকাকু। ফিল্টারের টুকরোগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললেন, "আপনার বাবা সম্ভবত স্মোক করতেন না।"

অমিতেশবাবু বিস্মিত কণ্ঠে সমর্থন করলেন কথাটা। বললেন, "ঠিকই ধরেছেন। সিগারেটের টুকরোগুলো বাবার বন্ধুদের। কেউ দেখা করতে এলে উনি অ্যাশট্রেটা বের করে দিতেন। আপনি বুঝলেন কী করে ব্যাপারটা?"

"কাল রাতের খাওয়া ফ্রেশ ফিল্টারের টুকরো নেই আর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফিল্টার দেখে।" বলে দীপকাকু জানতে চাইলেন, "শেষ কোন বন্ধু দেখা করতে এসেছিলেন?"

"আমি ঠিক বলতে পারব না। আমি তো সবসময় বাড়ি থাকি না।"

"কে বলতে পারবে?"

"কেশব, মানে আমাদের কাজের লোক জানতে পারে। দাঁড়ান, ডাকছি।"

ডাকতে হল না। দোরগোড়ার ভিড় থেকে কেশব ঘরে এসে হাজির। কেশবকে নতুন করে প্রশ্নটা করলেন দীপকাকু। সে মাথা চুলকে বলল, "মনে পড়ছে না।"

দরজায় ভিড়ের দিকে তাকালেন দীপকাকু। ডক্টর নন্দীর দুই পুত্রবধূ সরে গেলেন। অপার কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নাতি-নাতনি। তাদেরও বোধহয় উত্তরটা জানা নেই।

ফের অ্যাশট্রে নিয়ে পড়লেন দীপকাকু। ঘেঁটেঘুঁটে একটা ফিল্টার বের করলেন। গা ঘিনঘিন করছে ঝিনুকের। দীপকাকুর কোনও বিকার নেই। ফিল্টারটা আতশকাচের সামনে ধরে কিছুক্ষণ দেখে বললেন, "ডক্টর নন্দীর বন্ধুদের মধ্যে কে পান খান?"

ঝিনুক আশঙ্কিত হয়, অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ চালাতে গিয়ে স্লিপ অফ টাং হয়ে যাচ্ছে দীপকাকুর, হাতে এক জিনিস, বলছেন অন্য কিছুর কথা। ঘরের বাকি দু'জন ঝিনুকের মতোই হতবাক। একটু পরে দীপকাকু নিজেই বলতে শুরু করেন, "এই সিগারেটটা যাঁর খাওয়া, তিনি পানও খান, লাল ছোপ লেগে রয়েছে ফিল্টারের শেষে।"

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেশব বলে ওঠে, "কবরেজমশাই। উনি বাবুর কাছে হপ্তায় এক-দু'বার অন্তত আসতেন।"

আজকাল কারও বাড়ি কবিরাজমশাই আসেন শুনে অবাক হল ঝিনুক। কেন আসতেন, বোঝা যাচ্ছে না। দীপকাকু বলে ওঠেন, "অমিতেশবাবু, আপনার বাবার হাই ব্লাডপ্রেশার, সুগার কি অনেক দিনের সঙ্গী?"

অমিতেশবাবুর এক্সপ্রেশন হল দেখার মতো, ম্যাজিক দেখে

যেমন বোকা ও আনন্দিত হয় মানুষ। বলে উঠলেন, "মার্ভেলাস। এতক্ষণে আমি মেনে নিচ্ছি, আপনি একজন বড় মাপের গোয়েন্দা। কী করে আন্দাজ করলেন বাবার এইসব রোগ আছে?"

নিরুত্তাপ গলায় দীপকাকু বলেন, "বেজায়গায় হাততালি দিচ্ছেন মি. নন্দী, ইট্‌স ভেরি সিম্পল, ট্যাবলেটের ফয়েলগুলো সুগার, প্রেশারের কমন ওষুধ, আর চায়ের সরঞ্জামের মধ্যে দেখলাম চিনির বদলে স্যাকারিন।"

সূত্রগুলো শুনে অমিতেশবাবুর বিস্ময় বাড়ল বই কমল না। দীপকাকু ফের বলেন, "অসুখে বোধহয় খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন, সেই কারণেই রেখে যাওয়া নোটে লিখেছেন জরাব্যাধির কথা।"

"হতেও পারে।" চিন্তান্বিত গলায় বললেন অমিতেশবাবু।

"কবিরাজমশাই কি ডক্টর নন্দীর চিকিৎসার কারণে আসতেন?"

দীপকাকুর প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়েন অমিতেশবাবু। বলেন, "আমি ঠিক জানি না। ভদ্রলোককে একবার মাত্র দেখেছি। দুঃস্থ, অভাবী চেহারা। বাবার বন্ধু হিসেবে ঠিক মানা যায় না। হয়তো আর্থিক সাহায্য পেতে বাবার কাছে আসতেন। সরাসরি টাকা না দিয়ে, বাবা তাঁর কাছে ওষুধ নিতেই পারেন, খেতেন বলে মনে হয় না।"

"তা হলে চিকিৎসা করাতেন কার কাছে?"

"ডা. অমল চ্যাটার্জি। আমাদের হাউজ় ফিজ়িশিয়ান। এ পাড়াতেই থাকেন। বাবার বন্ধুর মতো। বাবার কাছে নিছক আড্ডা মারতেও আসেন।"

"কবিরাজমশাইয়ের প্রতি আপনার বাবার দুর্বলতার কারণ?"

"সরি, এ ব্যাপারেও আমি কিছু বলতে পারছি না। বাবা আমাদের কাছে ততটা খোলামেলা ছিলেন না, একদম ব্যক্তিগত কোনও ধরনের প্রশ্ন করতে সাহস পেতাম না আমরা।"

অমিতেশবাবুর কথার পর খানিকক্ষণ সময় নিয়ে কী যেন ভাবলেন দীপকাকু। তারপর বললেন, "খুব রিসেন্টলি আর-একজন আপনার বাবার কাছে আসতেন, যিনি কিংসাইজ় বিদেশি সিগারেট খান। চার- পাঁচদিন আগে এসেছিলেন। ফিল্টারগুলো দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে। তিনি কে?"

অমিতেশবাবু জানেন না, কেশবের দিকে তাকান। কপাল কুঁচকে কেশব বলে, "বাবুর বন্ধুবান্ধব অনেকেই আসতেন। কে লম্বা সিগারেট খেতেন, খেয়াল করিনি। আমি তো এ ঘরে বড় একটা আসতাম না, লালুই বাবুর সব কাজ করত।"

উত্তর আসে দোরগোড়া থেকে, "রামেন্দুদাদু।"

গলাটা বাচ্চা ছেলেটির। দীপকাকু হাতের ইশারায় ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে ডেকে নেন। বছর বারোর ছেলেটাকে দেখেই বোঝা যায়, এমনিতে দুষ্টু, এখন একটু থতমত খেয়ে আছে।

সামনে এসে দাঁড়াতে দীপকাকু তার নাম জিজ্ঞেস করেন। সে বলে, "অনির্বাণ নন্দী।"

"ডক্টর বিপুল নন্দী তোমার দাদু?" বলেন দীপকাকু।

মাথা হেলিয়ে 'হ্যাঁ' বলে অনির্বাণ। দীপকাকু জিজ্ঞেস করেন, "রামেন্দুদাদুকে তুমি লাস্ট কবে আসতে দেখেছিলে এ বাড়িতে?"

একটু ভেবে অনির্বাণ বলে, "তখন লালুদা ছিল। রামেন্দুদাদুর সিগারেট আনতে মোড়ের দোকানে গিয়েছিল লালুদা, আমিও গিয়েছিলাম সঙ্গে।"

"লালুদা তার মানে তোমাকে খুব ভালবাসত, দেশের বাড়ি চলে গেল কেন?" জানতে চান দীপকাকু।

"দাদু লালুদাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"কেন?"

"দাদুর জিনিসপত্তর খালি হারিয়ে যাচ্ছিল, লালুদা খুঁজে দিতে

পারত না।"

"কী-কী জিনিস হারিয়ে যাচ্ছিল দাদুর?"

"চশমা, পেন, ডায়েরি, বিস্কুটের কৌটো, ফ্লপি, ফাইল আরও অনেক কিছু।"

"ও কে", বলে দীপকাকু এবার দৃষ্টি ফেরালেন অমিতেশবাবুর দিকে। বললেন, "এ নিশ্চয়ই আপনার ভাইপো। দাদুর অনেক খবর রাখে দেখছি!"

অর্নিবাণকে কাছে টেনে নেন অমিতেশ। স্নেহমিশ্রিত গলায় বলেন, "বাবা সবাইকে দূরে সরিয়ে রাখলেও, একে পারত না। সময় অসময় ঢুকে যেত দাদুর ঘরে। আমার তো মনে হয় বাবার জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখত অনি। বকুনি খেত লালু।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে অনির্বাণ, "মোটেই আমি সব কিছু লুকোতাম না। দাদু নিজেই অনেক কিছু হারিয়ে ফেলে, পরে খুঁজে পেত।"

কথাগুলো দীপকাকুর কানে ঢুকছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। ঠোঁটের নীচে আঙুল রেখে মেঝের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন। ঘরের মধ্যে এখন শুধুই টেবিল ক্লকের টকটক শব্দ।

চিন্তা ভেঙে দীপকাকু অমিতেশবাবুকে বলেন, "রামেন্দুবাবুর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন?"

"পারব। বাবার স্কুলবেলা থেকে বন্ধু। যাদবপুরেও একসঙ্গে পড়েছেন। তারপর সেই যে বিদেশ চলে যান, ফিরেছেন একমাস হল। আমি শুনেছি ইতিমধ্যে বাবার কাছে বেশ কয়েকবার এসেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।"

"ওঁর ঠিকানা?"

"ভবানীপুরে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটালের সামনের গলিতে ওঁর পৈতৃক বাড়ি। এখন ওখানেই আছেন কিনা জানি না। ওঁর পুরো নাম

রামেন্দু মল্লিক।"

নাম, অ্যাড্রেস ঝিনুক নোট করে নিল। দীপকাকু আড়চোখে দেখে নিয়ে অমিতেশবাবুকে বললেন, "আর-একজনের নাম-ঠিকানা আমার লাগবে, কবিরাজমশাই।"

"নাম আমি বলতে পারব, নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। শিয়ালদার কাছে কোথায় যেন চেম্বার আছে।"

"ফাইন।" বলে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন দীপকাকু। একটু পরে বললেন, "একটাই শুধু খচখচানি থেকে গেল..."

"কী?" জানতে চায় ঝিনুক।

"যে-পাতায় উনি নোট রেখে গিয়েছেন, সেই ছোট নোটবুকটা কোথাও দেখছি না।"

ঝট করে একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় আসে ঝিনুকের, দীপকাকুকে বলে, "ওটা আলমারিতে থাকতে পারে।"

"থাকার কথা নয়, পাতা ছিঁড়ে বিদায়ী চিঠি লেখার পর নোটবুক আলমারিতে তুলে রাখা একটু অস্বাভাবিক। তবু দেখা যেতে পারে। কারণ, চিঠির বয়ানটা মোটেই স্বাভাবিক নয়।"

দীপকাকুর কথা শেষ হতেই অমিতেশবাবু বলেন, "চাবি কোথায় আমি কিন্তু জানি না।"

"আমি জানি।" বলে ওঠে অনির্বাণ। অনুমতির তোয়াক্কা না করে সোজা চলে যায় বইয়ের র‍্যাকের সামনে। একটা মোটাসোটা বই বের করে, তার মধ্যে চাবি। ডক্টর নন্দী হয়তো ওকে লুকোনোর জন্যই চাবিটা ওখানে রেখেছিলেন।"

চাবি নিয়ে দীপকাকু আলমারি খুলতে যাবেন, ঝিনুকের চোখে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য, পাল্লা খোলার সঙ্গেসঙ্গে ডক্টর নন্দীর মৃতদেহ দীপকাকুর ঘাড়ে এসে পড়ছে।

তেমন কিছু ঘটল না। কাপড়-জামায় ঠাসা একটা সাধারণ

আলমারি যেমন হয়, তেমনই। লকারটাও খুলে ফেললেন দীপকাকু। সেখানে বেশ কিছু ফ্লপি, ডিস্ক দেখা গেল, একটা ফোটো অ্যালবামও আছে। ফ্লপি, ডিস্ক নামিয়ে পিছন থেকে অ্যালবাম বের করলেন দীপকাকু। পাতা উলটে মন দিয়ে দেখতে লাগলেন ফোটোগুলো। ঝিনুক পাশে এসে দাঁড়ায়। বেশির ভাগই মিটিং কনফারেন্সের ফোটো, কিছু পারিবারিক ফোটোও আছে। অমিতেশবাবু এসে নিজের বাবাকে ফোটোর মধ্যে থেকে চেনালেন।

ছোটখাটো সম্ভ্রান্ত চেহারা ডক্টর নন্দীর। দু'-একটি ফোটোতে ডক্টর নন্দীর পাশে একটা গ্রাম্য লোককে দেখা যাচ্ছে। দীপকাকু বললেন, "এ নিশ্চয়ই লালু। এর দেশের বাড়ি কোথায়?"

"ওড়িশার বালাশোর জেলার কোনও একটা গ্রামে। বাবা আর বিশ্বনাথজেঠু চাঁদিপুরে বেড়াতে গিয়ে লালুকে নিয়ে আসেন। ওর তিনকুলে কেউ নেই।"

"বিশ্বানাথজেঠুর পরিচয়টা একটু দিন।" বলেন দীপকাকু।

"আমাদের দুটো বাড়ি পরেই থাকেন। বাবার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ বাড়িতে উনিই বেশি আসতেন। ওঁর সঙ্গে মর্নিংওয়াকে যেতেন বাবা। বিশ্বনাথজেঠু আজ ভোরে বাবাকে রাস্তায় দেখতে পাননি।"

অমিতেশবাবুর কথার মাঝে অ্যালবাম থেকে ডক্টর নন্দীর সঙ্গে লালুর সবচেয়ে স্পষ্ট ফোটোটা খুলে নিলেন দীপকাকু। বিছানায় নামিয়ে রাখা ফ্লপি ডিস্কগুলো থেকে না বেছে দুটো ফ্লপি তুলে নিলেন। কেশবকে বললেন, "একটা জুতোর ফাঁকা বাক্স দাও তো।"

বায়না শুনে ঝিনুক অবাক। কেশব অবুঝ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দীপকাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে বাক্স আনতে গেল।

দীপকাকু ততক্ষণে টেবিল ঘড়িটা হাতে তুলে নিয়েছেন। অমিতেশবাবুকে বলেন, "আপনার বাবার রেখে যাওয়া নোট,

ফোটো, ফ্লপি, ঘড়িটা, আপাতত আমার কাছে থাক। যথাসময়ে ফেরত দেব।"

মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে অমিতেশবাবুর তেমন সায় নেই, আমতা আমতা করে বলেন, "পুলিশ বাড়িতে ইনভেস্টিগেশনে এসে এগুলো যদি চায়..."

"আমার কার্ড তো আপনাকে দেওয়া আছে, ফোন নম্বরে একবার ডায়াল করবেন, বাকিটা সামলে নেব।"

অসন্তুষ্টি নিয়ে চুপ করে গেলেন অমিতেশবাবু। কেশব জুতোর বাক্স নিয়ে এসেছে, ফোটো, ফ্লপি, ডক্টর নন্দীর রেখে যাওয়া নোট এবং সবশেষে টেবিল ঘড়িটা সন্তর্পণে বাক্সে রাখলেন দীপকাকু। একটা দড়ি চেয়ে জুতোর বাক্সটা বেঁধে নিলেন। এবার চলে গেলেন অন্য প্রসঙ্গে, "লালু কি এ ঘরেই শুত?"

"না, এ ঘরের পিছনে একটা ঘর আছে, ওখানেই আমি আর লালু শুতাম।" বলল কেশব।

"চলো, ওই ঘরটা একবার দেখা যাক।"

"কী আর দেখবেন, লালু নিজের জিনিসপত্তর সব বেঁধে নিয়ে চলে গেছে।" বলে কেশব।

দীপকাকু বললেন, "তবু একবার দেখি।"

দীপকাকু ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বিছানায় রাখা ফোন সেটের রিসিভারটা কানে নিলেন। দেখলেন কানেকশন আছে কিনা। দীপকাকুর মুখ দেখে মনে হল, আছে। ফোনসেট তুলে রাখলেন টেবিলে। অমিতেশবাবুকে বললেন, "একটু সজাগ থাকবেন। এ ঘরে ফোন আসতে পারে।"

দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন দীপকাকু। ঝিনুক নোটবুক পকেটে রেখে এগোতে যাবে, কে যেন আলতো করে কনুই ধরে টান মারে। ঘুরে তাকাতে ঝিনুক দেখে, তার বয়সি সেই মেয়েটা। কখন যেন

ঘরে ঢুকে এসেছে! মেয়েটার মুখে আলাপি হাসি। বলে, "আমি পামেলা, তুমি?"

সৌজন্যের খাতিরে হাসিমুখে নিজের ভাল নাম বলে ঝিনুক। তার মন চলে গেছে দীপকাকুর পিছু পিছু। পামেলা ফের বলে, "তুমি বুঝি ডিটেকটিভের অ্যাসিস্ট্যান্ট?

মাথা হেলিয়ে 'হ্যাঁ' বলে ঝিনুক। উৎসাহী গলায় পামেলা বলে, "কাজটা দারুণ এক্সাইটিং না? ভীষণ থ্রিলিং! তুমি নিশ্চয়ই গেম অ্যান্ড স্পোর্টসে দারুণ। কী কী জানো তুমি? ক্যারাটে, রাইফেল-শুটিং...."

শুকনো হাসে ঝিনুক। লালুর ঘরে হয়তো এতক্ষণে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। অযথা তাকে আটকে রেখেছে পামেলা। হঠাৎই ঝিনুকের মাথায় আইডিয়া খেলে যায়, এই কেসের ব্যাপারে পামেলার একটা ছোট্ট করে ইন্টারভিউ নিলে কেমন হয়! দীপকাকুর স্টাইলে ঝিনুক বলে, "আচ্ছা পামেলা, তুমি ডক্টর নন্দীকে কাল-পরশু কেমন দেখেছ? কোনও অসংলগ্ন কথাবার্তা, আচার-আচরণ করছিলেন কি?"

"নাঃ, দাদু একদম নর্মাল ছিল, ইনফ্যাক্ট দাদু বাড়ির সবার চেয়ে বেশি স্বাভাবিক, ঠান্ডা মাথার মানুষ।"

"তোমার কী মনে হয়, দাদু কেন নিরুদ্দেশ হলেন?"

মুখে চিন্তা ঘনাল পামেলার। অন্যমনস্ক গলায় বলে, "বুঝতে পারছি না। তবে দাদুর সঙ্গে বাবা-কাকার একদম পটত না।"

সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক জানতে চায়, "ঝগড়া হত?"

"না, ঠিক ঝগড়া নয়, কোনও বিষয়েই মতের মিল হত না। রাতে ডাইনিং টেবিলে সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া হয়। দাদু ইদানীং ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিতে বলত। হতে পারে সংসারের উপর অভিমান করে দাদু চলে গেছে।"

তথ্যটা মনের মধ্যে নোট করে নেয় ঝিনুক। বলল, "তোমার সঙ্গে আর-একদিন ভাল করে গল্প করা যাবে, এখন যাই, দেখি লালুর ঘরে কী হচ্ছে।"

পামেলার বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল ঝিনুক।

লালু-কেশবের ঘরে এসে ঝিনুক দেখে, দীপকাকুর হাতে বেশ ক'টা ড্রয়িংশিট। মন দিয়ে আঁকাগুলো দেখছেন দীপকাকু।

অপটু হাতে জঙ্গল, পাহাড়, নদীর পেনসিল স্কেচ। নিশ্চয়ই অনির্বাণের আঁকা। এত মন দিয়ে দেখার কী আছে ভাবতে গিয়ে দীপকাকুর কথায় হোঁচট খায় ঝিনুক, বলছেন, "রং ইউজ় করত না লালু?"

অনির্বাণ উত্তর দেয়, "না, দাদু ওকে শুধু স্কেচ করা শেখাছিল। লালুদার ভাল লাগত না, প্যাস্টেল কালার চাইত আমার কাছে।"

ঝিনুক বুঝতে পারে এসব ড্রয়িং লালুর। নিজের জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে গেলেও আঁকাগুলো ফেলে গেছে।

"লালুদাকে তোমার দাদু আর কী কী শেখাত?" অনির্বাণকে প্রশ্ন করলেন দীপকাকু।

"লেখাপড়া শেখাত।" বলে, ঘরের কোণে মেঝেয় রাখা বইখাতা নিয়ে এল অনির্বাণ। দীপকাকু উলটেপালটে দেখে অমিতেশবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "ডক্টর নন্দীর কি ড্রয়িংয়ের ঝোঁক ছিল?"

ঠোঁট উলটে মাথা নাড়েন অমিতেশ। বলেন," না, তেমন তো কিছু দেখিনি।"

বেশ বড় করে 'হুম' বললেন দীপকাকু, বই, খাতা, ড্রয়িংশিট কেশবকে দিয়ে, হাতের ধুলো ঝাড়লেন। তারপর বললেন, "আপাতত আমার ইনভেস্টিগেশন শেষ।"

"ঠিক বুঝলাম না।" বললেন অমিতেশবাবু।

দীপকাকু বলেন, "আপনি যদি চান তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাই, সে

ক্ষেত্রে আপনাকে আমার ক্লায়েন্ট হতে হবে। অর্থাৎ, যা কিছু খরচ...”

কথা শেষ হতে না দিয়ে অমিতেশবাবু বলেন, “বুঝেছি।” তারপর কী যেন ভাবতে থাকেন। দীপকাকুর এরকম ব্যবসায়িক আচরণ দেখে খারাপ লাগে ঝিনুকের। অবশ্য এটাও ঠিক, দীপকাকু তো শখের গোয়েন্দা নন, এটাই ওঁর প্রফেশন।

ভাবনা শেষ করে অমিতেশবাবু গম্ভীরভাবে বলেন, “আপনি কী বুঝলেন, এক-দু'দিনের মধ্যে বাবা নিজের থেকে ফিরে আসবেন না?”

“না। শুধু তাই নয়, ডক্টর নন্দী স্বইচ্ছায় নিরুদ্দেশ হননি, কিডন্যাপ্‌ড হয়েছেন।”

দীপকাকুর কথায় ঘরের সবাই চমকে উঠল। প্রবল উৎকণ্ঠায় অমিতেশবাবু বলে উঠলেন, “আপনি শিয়োর?”

“হান্ড্রেড পারসেন্ট।” আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন দীপকাকু। ঝিনুক ভেবে কূল করতে পারছে না, কী করে দীপকাকু এত নিশ্চিত হচ্ছেন।

কী একটু ভেবে নিয়ে অমিতেশবাবু জানতে চান, “বাবাকে কেন কিডন্যাপ করা হল?”

“সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো টাকার জন্য।” চিন্তান্বিত অন্যমনস্ক গলায় বললেন দীপকাকু। অমিতেশবাবু বলেন, “কই, এখনও তো মুক্তিপণ নিয়ে কোনও ফোনটোন এল না।”

“আসবে, আবার না-ও আসতে পারে।” ভাবনার গভীরে ডুব দেওয়া অবস্থায় কথাটা বললেন দীপকাকু।

এবার অমিতেশবাবুর গলায় যেন একটু চ্যালেঞ্জের সুর। বলেন, “যদি সত্যিই বাবা কিডন্যাপ্‌ড হয়ে থাকেন, কেসটা আপনি নিন। আই উইল পে ফর দ্যাট। অ্যাডভান্স লাগবে কিছু?”

"দিলে ভাল।" নির্বিকার কণ্ঠে বললেন দীপকাকু। অমিতেশবাবু তড়িঘড়ি পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সম্ভবত চেকবই অথবা ক্যাশ আনতে।

ঝিনুকরা এখন ট্যাক্সিতে। বাড়ি ফিরছে। দীপকাকুর বুকপকেটে অমিতেশবাবুর দেওয়া চেক। ট্যাক্সির জানলা দিয়ে আসা হাওয়ায় প্রজাপতির ডানার মতো ফরফর করে উঠছে চেকটা। ধড়ফড়ানি তৈরি হচ্ছে ঝিনুকের বুকে। দীপকাকুর ধারণা যদি ভুল প্রমাণিত হয়! ডক্টর নন্দীর অপহৃত হওয়ার কোনও সূত্রই দেখতে পাচ্ছে না ঝিনুক। এমন তো নয়, পসার ভাল যাচ্ছে না বলে কিছু টাকা পকেটে পুরে নিলেন দীপকাকু। এই মুহূর্তে ওঁর বসে থাকার মধ্যেও কেমন একটা নিশ্চিন্ত ভাব। চিন্তায় নাজেহাল ঝিনুক খুবই নিরীহ গলায় দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "আপনি কি অ্যাডভান্স ফেরত দেন?"

মুখ ফেরান দীপকাকু। কপালে বিরক্তির রেখা। বলেন, "হঠাৎ এ কথা কেন?"

"না, মানে ধরা যাক, আজ রাতের মধ্যেই ফিরে এলেন ডক্টর নন্দী। তখন তো আপনার অ্যাডভান্সটা ফেরত দেওয়া উচিত।" যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে কথাটা বলে ঝিনুক।

মিহি হাসি ফুটে ওঠে দীপকাকুর ঠোঁটে। বলেন, "আমি খুঁজে না দিলে ওঁকে পাওয়া খুব মুশকিল। যে বা যারা কিডন্যাপ্ করেছে, খুবই পাকা মাথার লোক। শুধু একটাই মেজর ক্লু ফেলে গিয়েছে।"

"কী সেটা?" ভীষণ আগ্রহে জানতে চায় ঝিনুক।

"তুমি তো অনেক কিছুই নোট করলে, আসল জিনিসটা চোখ এড়িয়ে গেল!"

ঝিনুক চুপ করে থাকে। অপেক্ষা করে দীপকাকুর পরের কথার জন্য। জানলার বাইরে তাকিয়ে দীপকাকু বলেন "টেবিল ক্লকের

অ্যালার্মের কাঁটা পাঁচটায় সেট করা ছিল।"

ঘড়িটা দূর থেকে দেখেছে ঝিনুক, অত সূক্ষ্ম ব্যাপার লক্ষ করা সম্ভব নয়। দীপকাকুকে আর সে কথা বলে না ঝিনুক। মাথায় ঘুরছে একটাই কথা, অ্যালার্মের কাঁটার সঙ্গে অপহরণের কী সম্পর্ক? প্রশ্নটা করেই ফেলে ঝিনুক। দীপকাকু ভর্ৎসনার সুরে বলেন, "ভাবো, অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছ, এটুকু বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারছ না?"

দীপকাকু তাকে অ্যাসিস্ট্যান্টের স্বীকৃতি দিচ্ছেন শুনে, এতটাই আপ্লুত হয়ে গেল ঝিনুক, কোনও ভাবনাই এল না মাথায়। দীপকাকু নিজেই বলতে শুরু করেছেন, "অমিতেশবাবুর কাছে আমরা শুনেছি, ডক্টর নন্দী সকাল ছ'টায় হাঁটতে বেরোতেন, অ্যালার্ম কেন পাঁচটায় দেওয়া থাকবে? কেউ নিশ্চয়ই কাজটা করেছে, অন্ধকার থাকতেই নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন ডক্টর নন্দী। অপহরণ করতে দুষ্কৃতীদের অসুবিধে হয়নি।"

তক্ষুনি পালটা যুক্তি দেয় ঝিনুক, "ডক্টর নন্দী নিজেও তো অ্যালার্মটা আগে সেট করে রাখতে পারেন, সবার অলক্ষে নিরুদ্দেশ হবেন বলে।"

"সেটা ধরে নেওয়া যেত, তদন্ত করতে গিয়ে এমন কিছু বিষয় চোখে পড়ল, সম্ভবনাটা বাতিল করে দেওয়া যায়। ঘড়িটা সঙ্গে নিলাম ফরেনসিক টেস্ট করানোর জন্য। দেখতে হবে অ্যালার্মের সুইচে কার হাতের ছাপ আছে?"

কেসটা গুরুতর হয়ে উঠছে দেখে, ট্যাক্সির সিটে সোজা হয়ে বসে ঝিনুক। মাথায় ঘুরতে থাকা পুরনো একটা প্রশ্ন করে নেয়, "আচ্ছা, আমাদের জন্য লেখা চিঠি আর বাড়িতে রেখে যাওয়া নোটের হাতের লেখা কি এক? আপনি শিয়োর?"

"উপর-উপর দেখে তাই তো মনে হল, আরও খুঁটিয়ে দেখতে হবে। ফ্লপি দুটো কম্পিউটারে ফেলে দেখলে হয়তো আরও কিছু

সূত্র পাওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে ভাল হত নোটবুকটা যদি পেতাম।”

“কেন?” সাগ্রহে জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, “আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, নোটবইয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল, ইচ্ছে করেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। নোটবুকের পাতায় লেখা চিঠিটা অজস্র কাটাকুটিতে ভরা, এরকমটা অভ্যেস নয় ডক্টর নন্দীর। আমাদের যে চিঠি লিখেছেন, তাতে কোনও কাটাকুটি নেই। ভাষাও স্পষ্ট, সাবলীল।”

কথার পিঠে ঝিনুক বলে, “তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, অক্ষর এবং লাইনগুলো কেটেছে অন্য কেউ?”

“হ্যাঁ। আমি ঠিক এটাই সন্দেহ করছি।”

ভ্রু কুঁচকে একটু ভেবে নেয় ঝিনুক। বলে, “এটা কি অমিতেশবাবুর কাজ? চিঠিটা আনতে বেশ দেরি করছিলেন।”

দীপকাকু মাথা নেড়ে নাকচ করে দেন ঝিনুকের আন্দাজ। বলেন, “কাটাকুটি করে চিঠিটার অন্য মানে তৈরি করার মতো সময় নেননি। কাজটা আগেই কেউ করেছে। অমিতেশবাবুও আগে থেকে করে রাখতে পারেন।”

“তা হলে যা দাঁড়াল, ডক্টর নন্দীর হারিয়ে যাওয়ার পিছনে বাড়ির কারও হাত আছে।”

“এগ্‌জ্যাক্টলি।”

ফের একটু ভেবে নিয়ে ঝিনুক বলে, “ছোটছেলেকে নিশ্চয়ই সন্দেহের বাইরে রাখতে পারি আমরা। কেননা সে এখন টুরে।”

“না। তাকেও সন্দেহের তালিকায় রাখতে হবে। সে টুরে গেছে কাল, অ্যালার্ম সেট করা তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। চিঠিটা টেবিলে পেপারওয়েট দিয়ে চাপা রাখাটা হয়তো সে অন্য কাউকে দিয়ে করিয়েছে।”

দীপকাকুর ভাবনা তেমন যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না ঝিনুকের। বলেই ফেলে, "নিজের বাবাকে অপহরণ, ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে না? উদ্দেশ্যটা কী?"

"হয়তো সম্পত্তিগত বিষয়। কোনও এক ছেলের চাহিদা মেটাচ্ছেন না ডক্টর নন্দী। অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। এখন অবধি পরিষ্কার ধারণা করে উঠতে পারিনি। তবে ইনভেস্টিগেশনে অনেক অস্পষ্ট ইঙ্গিত পেলাম।"

কেসটাকে নিয়ে বেশ গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছেন দীপকাকু, অ্যাডভান্স নিয়ে অন্যায় কিছু করেননি। এই সময় ঝিনুক নিজের সংগৃহীত তথ্যটা দেয়, "ডক্টর নন্দীর নাতনি পামেলার সঙ্গে কথা হল। বলছিল, বাবা-কাকার সঙ্গে দাদুর একদম পটত না। আপনার ধারণাই মনে হচ্ছে ঠিক, দু'ছেলের কোনও একজন..."

কথার মাঝে দীপকাকু বলে ওঠেন, "ধারণা নয়, প্রমাণ চাই। বাবার সঙ্গে ছেলেদের যে বনিবনা ছিল না, আলাদা ফোন, কাজের লোক দেখেই সেটা আন্দাজ করা যায়। কাউকে জিজ্ঞেস করে জানতে হয় না।"

তথ্যটা গুরুত্ব পেল না বলে হতাশ হয় ঝিনুক। ট্যাক্সির জানলা দিয়ে দ্যাখে, টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আর মিনিটখানেকের মধ্যেই বাড়ি। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঝিনুক দীপকাকুর কাছে জানতে চায়, "কাল আমাদের তা হলে কী প্রোগ্রাম?"

"একটা ফোনের উপর সেটা নির্ভর করছে।"

"মানে?"

"যারা অপহরণ করেছে, তারা ফোন একটা করবেই। তোমার বাড়ির ফোনে অথবা আমার মোবাইলে হুমকি দিতে পারে।" কেসটা ছেড়ে দিতে বলবে। অমিতেশবাবুর ফোনে মুক্তিপণ চাইতে পারে। ওই ফোন কলটার পরই ঠিক করব আমাদের কাজ।"

"ফোনটা যদি না আসে?"

কথাটা দীপকাকু শুনলেন কিনা বোঝা গেল না। জানলার বাইরে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন! ঝিনুকদের পাড়ায় ঢুকে পড়েছে গাড়ি।

রাত কেটে গিয়ে সকাল হয়ে গেল, ঝিনুকদের বাড়িতে হুমকি দিয়ে কোনও ফোন এল না। কাল থেকে যতবার ফোন বেজেছে, সচকিত হয়েছে ঝিনুক। ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলেছে, সবই আত্মীয়বন্ধুর ফোন। ঝিনুকের হতাশ গলা শুনে দু'-একজন তো বলেই বসল, "তোর কিছু হয়েছে?"

রাতে একটা বিচ্ছিরি স্বপ্নও দেখে ফেলল ঝিনুক। তদন্তের কারণে সে আর দীপকাকু ডক্টর নন্দীর বাড়িতে গিয়ে দ্যাখে, ফিরে এসেছেন বিপুল নন্দী। বাড়ির লোকের সঙ্গে বসে দিব্যি গল্প করছেন। ঝিনুকরা ঢুকতে, একে অপরের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসছেন।

ইতিমধ্যে দীপকাকুর মোবাইলে দু'বার ফোন করেছে ঝিনুক, সুইচ অফ। দীপকাকুর মোবাইল দিনের বেশির ভাগটা ঘুমিয়ে কাটায়। রাতে তো কথাই নেই। হুমকি দিতে চাইলে দুষ্কৃতীরা দীপকাকুর নাগাল পাবে না।

কিছুক্ষণ আগে বাবা একবার জিজ্ঞেস করেছেন, "কী রে, তোদের কেসের কতদূর?"

"এগোচ্ছে।" বলে, কথা এড়িয়ে গেছে ঝিনুক।

"গাড়ি রেখে যাব নাকি? তোদের লাগবে?"

"যাও রেখে।" বলে, ঝিনুক নিজের ঘরে চলে এসেছে। নতুন কেসের ব্যাপারে মা এখন অবধি কিছু জানেন না। সকাল থেকে ঝিনুকের আচরণ দেখে সামান্য সন্দেহ হয়েছে, জিজ্ঞেস করেছেন, "তুই এরকম আনচান করছিস কেন?"

উত্তর দেয়নি ঝিনুক। এখন নিজের চেয়ার-টেবিলে বসে গল্পের খাতাটা টেনে নিতে যাবে, শুনতে পায় ফোনের শব্দ। এই ফোনটা ঝিনুক ধরবে না। বাবা ধরুন।

ড্রয়িং থেকে বাবার গলা ভেসে আসে, "ঝিনুক তোর ফোন।" চেয়ার ছেড়ে উঠে আসে ঝিনুক। তা হলে সত্যিই কি এল সেই ফোন? কোনও তাড়াহুড়ো না করে ধীর পায়ে ড্রয়িংয়ে এসে রিসিভার তোলে ঝিনুক। "হ্যালো" বলে, অপেক্ষায় থাকে অচেনা কর্কশ কণ্ঠের।

"কোনও ফোন পেলে?" অপরপ্রান্তে দীপকাকুর গলা। একটু যেন হতাশ হয় ঝিনুক। বলে, "না, আপনি পেলেন?"

"পেয়েছি।"

মুহূর্তে চাঙা হয়ে ওঠে ঝিনুক। সোৎসাহে জানতে চায়, "কী বলল ফোনে?"

ওপ্রান্তে খানিক নীরব থাকার পর দীপকাকু বলেন, "ফোনটা করেছিলেন ডক্টর নন্দী নিজে।"

"সে কী!" বলে প্রায় চিৎকার করে ওঠে ঝিনুক। উত্তেজনা সামলে জানতে চায়, "কী বললেন উনি?"

"খুঁজতে বারণ করলেন ওঁকে। বিশেষ প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করেছেন। দরকার মিটলেই বাড়ি ফিরবেন। ডেকে পাঠাবেন আমাদের। এভাবে বিব্রত করার জন্য ক্ষমা চাইলেন বেশ কয়েকবার।"

ঝিনুক এতটাই দমে যায়, মুখ দিয়ে কথা সরে না। ওপ্রান্ত থেকে দীপকাকু বলেন, "রজতদার গাড়িটা কি আজ পাওয়া যাবে?"

"যাবে। আমি বাবাকে বলে রেখেছি। কিন্তু কেন?" বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চায় ঝিনুক।

"আজ বেশ কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে। সঙ্গে গাড়ি থাকলে

ভাল হয়। কখন, কোথায়, কতক্ষণ সময় লাগবে, আন্দাজ করা যাচ্ছে না।"

"যাবেন কোথায়?"

"আপাতত ডক্টর নন্দীর ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুর বাড়ি। যাঁরা ওঁর সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য দিতে পারবেন।"

"কী হবে ওঁর বিষয়ে জেনে?"

"ওঁকে খুঁজে পেতে সুবিধে হবে।"

ঝিনুক একটু থমকায়। তারপর অবাক সুরে বলে, "এই তো আপনি বললেন, খুঁজতে বারণ করেছেন উনি, তাও কেন..."

কথার মাঝে দীপকাকু ওপার থেকে বলে ওঠেন, "ফোনটা উনি করেননি, অন্য কেউ আমাদের ঠকাচ্ছে। যাতে আমরা আর ডক্টর নন্দীকে না খুঁজি।"

"কী করে বুঝলেন?" অধীর আগ্রহে জানতে চায় ঝিনুক। অপর প্রান্ত বলেন, "খুবই সোজা, মিনিট কুড়ির মধ্যে তোমাদের বাড়ি পৌঁছোচ্ছি। ততক্ষণে ভেবে রাখো।"

ফোন কেটে দিলেন দীপকাকু। ঝিনুক পড়ল গভীর গাড্ডায়। কিছুই যে মাথায় আসছে না। রিসিভার নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে দ্যাখে, সামনে মা। রাগ, বিরক্তি একসঙ্গে নিয়ে মা বলেন, "দীপঙ্করের সঙ্গে কথা বলছিলি মনে হল।"

ঝিনুক চুপ করে থাকে। মা ফের বলেন, "তোমাকে আমি সাফ কথা বলে দিচ্ছি শোনো, আর নতুন কোনও কেসে তুমি জড়াবে না। মেয়েদের যা মানায় তাই নিয়ে থাকো।"

"কোথায় কেস মা, সে তো ধরাই দিচ্ছে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে!" কপট হতাশায় বলে ঝিনুক।

মা বলেন, "ওসব হেঁয়ালিমার্কা কথা ছাড়ো। আমি যা বলে দিলাম তার যেন অন্যথা না হয়।"

ইতিমধ্যে বাবা ঘরে ঢুকে এসেছেন। যেন কিছুই শোনেননি এমনভাবে মাকে বলেন, "অফিস যাওয়ার আগে আমাকে একটা জিনিস মনে করে সঙ্গে দিয়ো তো।"

"কী?" জানতে চান মা।

"ওই যে, ঝিনুকের ছবি দিয়ে কাগজে রানির চিঠি উদ্ধারের খবরটা বেরিয়েছিল না, তার কাটিং। অফিসে দু'জন স্টাফ নতুন জয়েন করেছে, তারা দেখতে চায়।"

"ঠিক আছে দিয়ে দেব। বলে ঘর থেকে বেরোতে যাবেন মা। বাবা হাসতে হাসতে বলেন, "কাটিংটা তো খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছ, পাঁচজনকে দেখিয়ে বেশ গর্ব হয়, মেয়েকে তা হলে বাধা দিচ্ছ কেন কাজে যেতে?"

বাবার কথার প্যাঁচে মা আরও রেগে যান। বলেন, "ঠিক আছে, আজই ওই কাটিংটা আমি নষ্ট করে দেব।"

হোমে ঘি দেওয়ার মতো ঝিনুক বলে ওঠে, "পারবেই না।"

মা গেলেন আরও রেগে, চেঁচামেচি করছেন, এদিকে নিউজ কাটিংটা ছিঁড়তে পারছেন না। ঝিনুক জানে আত্মীয়-পরিজনের বাড়িতে বেড়াতে গেলে, মা ওই কাগজটা নিজের টাকাপয়সার ব্যাগে রাখেন।

দীপকাকু এসে মাকে শান্ত করলেন। আবহাওয়া বুঝতে সময় নিলেন সেকেন্ডখানেক, বললেন, "বউদি, বাড়িতে না খেয়ে আপনার হাতের জলখাবার খেতে এসেছি।"

মা তাতেই অর্ধেক গলে জল। বাকিটা দীপকাকু ম্যানেজ করলেন এই বলে, "এবারের কেসটা একদম মিয়োনো, ঠান্ডা। মারপিট, মৃত্যুর হুমকি কিচ্ছু নেই। দু'-চারজন বয়স্ক, জ্ঞানী মানুষ এই রহস্যের

পাত্রপাত্রী। এখানে শুধুই মাথার কাজ। ঝিনুক সঙ্গে থাকলে ওর ব্রেনটাও শার্প হবে।"

গোবেচারা চেহারা হলেও, দীপকাকুর মধ্যে আছে অদ্ভুত কনভিন্সিং পাওয়ার। মা রাজি হয়ে গেলেন ঝিনুককে ছাড়তে। বেরোনোর সময় দীপকাকুকে বললেন, "দীপঙ্কর, তুমি বলেই ছাড়লাম। মেয়েটাকে চোখেচোখে রাখবে। যা চঞ্চল!"

বাধ্য ছাত্রের মতো ঘাড় নাড়ছিলেন দীপকাকু। ওঁর মোটা গ্লাসের চশমার দিকে তাকিয়ে আর-একটু হলে হেসে ফেলছিল ঝিনুক, যে-মানুষটা এই চশমা পরেও নিজের মাথাটা ঠিক মতো আঁচড়াতে পারেন না, সিঁথি আঁকাবাঁকা হয়ে যায়, তাঁকে কিনা মা বলছেন, চোখেচোখে রাখতে!

ঝিনুকরা এখন চলেছে ভবানীপুরে। আশুদা চালাচ্ছে গাড়ি। নিজেদের গাড়িতে থাকলে ঝিনুকের বেশ একটা আত্মবিশ্বাস জাগে। যদিও গাড়িতে ওঠার পরই সেই বিশ্বাসে একটা বড়সড় ধাক্কা লেগেছে। দীপকাকু জানতে চেয়েছিলেন, "ভেবে বের করতে পারলে, কী করে বুঝলাম ফোনটা ডক্টর নন্দীর নয়?"

খুবই কুণ্ঠিত হয়ে দু'পাশে মাথা নেড়েছিল ঝিনুক। দীপকাকু বলেছিলেন, "জানতাম পারবে না। ধড়ের উপর যে-বস্তুটা আছে, তার পরিচর্যা বাইরের দিকে হয় বেশি। ভিতরটা তাই তেমন কাজ করছে না, বসে যাচ্ছে।"

খোঁচাটা হজম করে ঝিনুক। ফোনের ব্যাপারটা জানতে ভীষণ আগ্রহ হচ্ছিল। দীপকাকু বলতে শুরু করেন, "পয়েন্ট নম্বর ওয়ান, ডক্টর নন্দী আমার ফোন নম্বর জানেন না বলেই তোমার ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আত্মগোপন করেই যদি থাকবেন, ফোন নম্বর জোগাড় করে আমাকে বিরত থাকতে বলার কী দরকার! আমি যদি তাঁকে খুঁজেও পাই, গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসতে তো

বলব না। বিষয়টা ওঁর ব্যক্তিগত। পয়েন্ট টু, যে ফোন করেছিল, জানে, ডক্টর নন্দীর কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত নয়। তাই সে নির্দ্বিধায় ফোনটা করে। একটু সাবধানতা নিয়েছিল, রিসিভারে রুমাল চাপা দিয়ে বলছিল কথা। এর থেকে আর-একটা জিনিস প্রমাণ হয়, লোকটির সঙ্গে ভবিষ্যতে আমার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই ওই সতর্কতা। আমি কথা চালিয়ে যেতে চাইলেও, সে অল্প শব্দ খরচ করে ফোনটা কেটে দেয়। আমার সেল ফোনের স্ক্রিনে উঠেছিল ফোন বুথের নম্বর। খবর নিয়ে জানলাম, ধর্মতলা অঞ্চলের বুথের নম্বর এটা। এখন কথা হচ্ছে লোকটি কে? ডক্টর নন্দী কি তার হেফাজতে আছেন? আমরা তদন্তে নেমেছি, সে কীভাবে খবর পেল?"

খুব বেশি ভাবতে হয় না, উত্তর পেয়ে যায় ঝিনুক। বলে, "এই কেসে আপনি একমাত্র অমিতেশবাবুকে আপনার ফোন নম্বর দিয়েছেন। সন্দেহ তাঁকেই করা উচিত।"

যুক্তি শুনে সন্তুষ্ট হননি দীপকাকু। বলেছিলেন, "অমিতেশবাবু আমাদের দেওয়া তাঁর বাবার চিঠি পড়েছেন, জানেন, ওঁর বাবা আমার ফোন নম্বর জানেন না। এর পরেও ফোন করার মতো কাঁচা কাজ উনি করবেন না। তবে এটুকু ধরে নেওয়াই যায়, আমার সেল-এর নম্বরটা ওঁর থেকেই কেউ জেনেছে। ফল্‌স ফোনটার পরেই ডায়াল করলাম ডক্টর নন্দীর নম্বরে। অমিতেশবাবু তুললেন। জিজ্ঞেস করলাম, আমার নম্বরটা আর কাউকে জানিয়েছেন কিনা। বললেন, ছোটভাই ফিরে এসেছে, তাকে একবার মাত্র আমার কার্ডটা দেখিয়ে যত্ন করে তুলে রেখেছেন।"

"বললাম, একবার দেখুন তো, যেখানে রেখেছিলেন, সেটা এখনও সেখানে আছে কিনা?"

"যা ভেবেছিলাম তাই, অমিতেশবাবু ফোনে জানালেন, কার্ডটা নেই। মিথ্যেও বলতে পারেন, নয়তো কেউ চুরি করেছে অথবা

করিয়েছেন বাড়ির কাউকে দিয়ে। মোটমাট যা দাঁড়াল, অপরাধী আমাদের আশপাশে আছে, তাকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি অথবা করিনি।"

দীপকাকুর কথার পর ঝিনুক বলেছিল, "আমরা এখন অবধি ডক্টর নন্দীর ছোটছেলেকে দেখিনি। তার সঙ্গে একবার আলাপ করে নিলে হত না! ডোভার লেনের বদলে আমরা কেন ভবানীপুরে যাচ্ছি?"

উত্তরে দীপকাকু বললেন, "তদন্ত সবসময় স্টেপ বাই স্টেপ করতে হয়। আমরা এখন পর্যন্ত জানি না ডক্টর নন্দী কেন অপহৃত হলেন। সেটা যতক্ষণ না পরিষ্কার হচ্ছে, কাউকে সন্দেহ করার কোনও মানে হয় না।"

ঝিনুক বলেছিল, "কাল ডক্টর নন্দীর ঘর থেকে যেসব জিনিস নিলেন, তার থেকে কোনও সূত্রই কি পাওয়া গেল না?"

"গিয়েছে। তবে খুব সামান্য। ফ্লপি দুটো বাপ্পার কম্পিউটারে ফেলে বোঝা গেল, উদ্ভিদ নিয়ে কোনও জটিল গবেষণা করছিলেন নন্দী। যা বোঝার মতো ক্ষমতা আমার ও বাপ্পার কারওই নেই। আমার কথামতো বাপ্পা ইন্টারনেট সার্ফ করে বায়োটেকনোলজির লেটেস্ট পজিশন দেখে রেখেছে। যার সঙ্গে কোনও সঙ্গতি নেই ফ্লপির ম্যাটারের। এর থেকে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল, অমিতেশবাবুর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ওঁর বাবা সবার অগোচরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মোটেই অবসর যাপন করছিলেন না। এমনও হতে পারে, অমিতেশবাবু সবই জানেন, বিশেষ কারণে গোপন করেছেন আমাদের কাছে।"

দীপকাকুর অ্যানালিসিস শুনে ঝিনুক ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে বলেছিল, "তার মানে গবেষণার কারণেই কিডন্যাপ্‌ড হয়েছেন ডক্টর নন্দী?"

"এখন পর্যন্ত এটুকু ধারণা করা যেতেই পারে। রিসার্চ কী বিষয়ে করছিলেন, সেটা জানার জন্য ভবানীপুরে ডক্টর নন্দীর বন্ধু রামেন্দু মল্লিকের বাড়ি যাচ্ছি। ওঁরা অনেকদিন পর্যন্ত এক সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। রামেন্দুবাবু জানলেও জানতে পারেন ডক্টর নন্দীর গবেষণার বিষয়।" বলে সেই যে চুপ করেছেন দীপকাকু , মিনিটকুড়ি হয়ে গেল মুখে কোনও কথা নেই।

এখনও দুটো ব্যাপার জানার আছে ঝিনুকের, উসখুস করতে করতে জিজ্ঞেস করেই ফেলে, "ডক্টর নন্দীর নোটটার কি সমাধান হল? কাটা অক্ষরগুলো উদ্ধার করতে পারলেন?"

নীচের ঠোঁট উলটে মাথা নাড়েন দীপকাকু। অর্থাৎ এখনও সম্ভব হয়নি। পরের প্রশ্নে যায় ঝিনুক, "ঘড়ির অ্যালার্মের সুইচে হাতের ছাপ পাওয়া গেল?"

"এখনও রিপোর্ট পাইনি। দেওয়া আছে পরীক্ষা করতে। যে-কোনও সময় ফোনে রিপোর্ট আসবে।"

জগুবাবুর বাজার পেরিয়ে এলগিন রোডে ঢুকে পড়েছে ঝিনুকদের গাড়ি। একটু দূরে দ্যাখা যাচ্ছে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটাল। সাহেবি আমলের বাড়ি। লাল রং করা। হাসপাতালের মেন গেটের পাশে গাড়ি দাঁড় করায় আশুদা। ঝিনুক, দীপকাকু নেমে আসে। অমিতেশবাবু বলেছিলেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের উলটো দিকের গলিতে রামেন্দু মল্লিকের বাড়ি।

দু'পাশের গাড়ি দেখে রাস্তা ক্রস করতে যাবে ঝিনুক, চোখে পড়ে একটা কালো অলটো কার ঝিনুকদের গাড়ির ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল। গাড়িটা থেকে কেউ নামল না। ফলো করছিল নাকি?

দীপকাকু রাস্তার ওপারে চলে গিয়েছেন। সন্দেহ মাথা থেকে ঝেড়ে ঝিনুক অনুসরণ করে।

গলির মুখে এসে বাজারের ব্যাগ হাতে থাকা এক ভদ্রলোককে

ধরলেন দীপকাকু। রামেন্দু মল্লিকের বাড়িটা কোথায় জানতে চাইলেন। ভদ্রলোক এক চান্সে হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন।

উঁচু পাঁচিলঘেরা পুরনো দোতলা বাড়ি। সদর লক্ষ করে ঝিনুকরা এগোতে থাকে। এমন সময় কাছাকাছি কার যেন মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। এদিক-ওদিক দেখতে গিয়ে ঝিনুক দ্যাখে, দীপকাকুই পকেট থেকে ফোন বের করে কানে দিয়েছেন। যাক, রিং টোনটা ভদ্রস্থ হয়েছে, আগের মতো বিদ্‌ঘুটে নয়।

ফোনে কথা বলতে বলতে দীপকাকুর মুখটা কেমন যেন নিভে যাচ্ছে। পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ঝিনুক। কথা শেষ হয়েছে। সুইচ অফ করার আগে নম্বর সেভ করে নেন দীপকাকু। ঝিনুকের প্রথমে মনে হয়েছিল হাতের ছাপের রিপোর্ট এল বুঝি। নম্বর সেভ করা মানে অচেনা কারও ফোন। ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "কার ফোন?"

অন্যমনস্ক গলায় দীপকাকু বললেন, "আবার ফল্‌স ডক্টর নন্দীর ফোন।"

"কী বলছে এখন?" ভ্রু কুঁচকে জানতে চায় ঝিনুক।

কোনওভাবে টের পেয়েছে, তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। বারণ করছে খুঁজতে। অজ্ঞাতবাসে থাকাটা তার পার্সোনাল ব্যাপার। আমরা অনধিকার চর্চা করছি। এটা আইনি হিসেবে এক ধরনের অপরাধ।" বলে, রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন দীপকাকু। চেহারায় হতোদ্যম ভাব। একটু পরে বলেন, "কী করে জানতে পারছে বলো তো? ইনভেস্টিগেশনে বেরিয়েছি, তুমি আর আমি ছাড়া তো কেউ জানে না। খুবই বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের ফলো করা হচ্ছে।"

বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝিনুকের চোখে ভেসে ওঠে কালো অলটো কার। একটু আগে তাদের গাড়ির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

হসপিটালের দিকে ঘুরে জোর কদমে হেঁটে যায় ঝিনুক। গাড়িটা

এখনও ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ডার্ক উইন্ডো গ্লাস বন্ধ। ঝিনুক শিয়োর, ওর মধ্যে বসে আছে অনুসরণকারী, যে একটু আগে ফোন করেছিল দীপকাকুকে।

ঝিনুকের হাঁটা দৌড়োনোর মতো হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য কালো গাড়ি, চলন্ত ট্রাফিকের কারণে রাস্তা ক্রস করার আগে থামতে হল একটু। ঠিক তখনই কালো গাড়িটা ঝিনুকদের গাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে এগোতে শুরু করল। তার মানে টের পেয়েছে ঝিনুকের উদ্দেশ্য, কেটে যাচ্ছে। এবার সত্যিকারের দৌড় শুরু করে দেয় ঝিনুক। তার পায়ে স্নিকার্স, দীপকাকুর সঙ্গে প্রথম অভিযানের পর গিফ্‌ট করেছিলেন বাবা। আজ কাজে লাগছে। স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে কালো গাড়ি। ঝিনুক প্রাণপণে স্পিন্ট টানতে থাকে। উলটো দিক থেকে আসছে মিনিবাস। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে কী যেন বলে, শোনা যায় না। মিনিটখানেকের মধ্যে অন্যান্য ট্রাফিকের আড়ালে উধাও হয়ে যায় গাড়িটা।

দৌড় থামিয়ে দেয় ঝিনুক। বড়বড় নিশ্বাস পড়ছে, টান ধরেছে পেটে। দু'-চার জন পথচারী দাঁড়িয়ে পড়েছে ফুটপাতে, অসম প্রতিযোগিতাটা দেখছিল এতক্ষণ।

ফিরতে হবে। কোমরে দু'হাত রেখে ঘুরে দাঁড়ায় ঝিনুক। দ্যাখে, আশুদা গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে।

দরজা খুলে নেমে এলেন দীপকাকু। শাসনের গলায় বললেন, "হঠাৎ দৌড় প্র্যাকটিসের কথা মাথায় এল কেন?"

"ওই গাড়ি থেকে আমাদের ফলো করা হচ্ছিল।" দম নিয়ে বলে ঝিনুক।

"তা বলে তুমি গাড়ির সঙ্গে কম্পিটিশন করবে!" বলে, সুর পালটে ফেলেন দীপকাকু, টিভিতে দেখেছি, বড়বড় দৌড়বাজরা ট্রেনের সঙ্গে রানের মহড়া নিচ্ছে।"

খেপাচ্ছেন দীপকাকু। মাথা নিচু করে নেয় ঝিনুক। আশুদা গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। গাড়িতে গিয়ে বসে ঝিনুক। দীপকাকু উঠে আসেন।

এবার গাড়ি রাখা হল রামেন্দু মল্লিকের বাড়ির সামনে। পাঁচিলের গায়ে আর্চ টাইপ সদর দরজা। পিছন থেকে বোগেনভেলিয়ার ঝাড় উঁকি মারছে। .

গাড়ি থেকে নেমে এল ঝিনুকরা। দীপকাকু এগিয়ে গিয়ে ডোরবেল টিপলেন।

দরজার পাল্লায় পেতলের প্লেটে শুধু মল্লিক আর ঠিকানা লেখা। বেশ খানিকক্ষণ পর দরজা খুলল। স্যান্ডো গেঞ্জি পরা ষণ্ডামার্কা একটা লোক। কাজের লোক সম্ভবত। সে কিছু বলার আগেই দীপকাকু জিজ্ঞেস করেন, "রামেন্দু মল্লিক বাড়িতে আছেন?"

"আছেন, আপনারা?"

পরিচয় জানতে চাইছে লোকটা। উত্তরে দীপকাকু বলেন, "উনি আমাদের চিনবেন না। একটা বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে এসেছি।"

"ফোন করে নিয়েছিলেন আগে?" জানতে চায় লোকটা অর্থাৎ অ্যাপয়ন্টমেন্টের কথা বলছে। ঝিনুক ভাবে, এত ফর্মালিটির কী আছে, কে জানে! পরক্ষণেই খেয়াল হয়। রামেন্দুবাবু একজন বিদেশ ফেরত বিজ্ঞানী। এটুকু ওজন তো দেখাতেই হবে।

দীপকাকু পকেট থেকে নিজের কার্ড বের করে লোকটাকে দিলেন। বললেন, "বাবুকে গিয়ে দেখাও। আমরা অপেক্ষা করছি।"

কার্ড নিয়ে চলে গেল লোকটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। বলল, "আসুন।"

সদর ডিঙোলে বাগান। গাছপালা ঝোপঝাড়ের আকার নিয়েছে। পরিচর্যার অভাব। একটা পরির স্ট্যাচুও আছে বাগানের মাঝখানে।

মোরামের রাস্তা ধরে এগোতে থাকে ঝিনুকরা, সামনে দোতলা বাড়িটার গায়ে প্রাচীন বনেদিয়ানার ছাপ স্পষ্ট।

বৈঠকখানায় গিয়ে পৌঁছোয় ঝিনুকরা। কাজের লোকটা বলে, "আপনার বসুন। বাবুকে খবর দিচ্ছি।"

লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে না-যেতে দীপকাকু পৌঁছে যান তালা দেওয়া বুককেসের সামনে। বাইরে থেকে দেখতে থাকেন বইয়ের নাম।

ক্লান্ত ঝিনুক সোফায় বসে চোখ বোলায় ঘরের আসবাবে। সবই বেশ পুরনো আমলের। খানিক পরে ঘরে ঢোকেন রামেন্দু মল্লিক। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। অভিজাত চেহারা। সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে ওঠেন, "কী ব্যাপার? হঠাৎ আমার বাড়িতে গোয়েন্দা হানা!"

দীপকাকু ইতিমধ্যে সোফায় এসে বসেছিলেন। সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়ান। রামেন্দু মল্লিকের মৃদু রসিকতার উত্তরে বলেন, "ঠিক হানা নয়, শরণাপন্ন হওয়া বলতে পারেন।"

"ওঃ বাবা, তাই নাকি! আমার সৌভাগ্য।" বলে রামেন্দুবাবু হাতের ইশারায় দীপকাকুকে বসতে বলেন, নিজেও বসেন সোফায়। ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে বলেন, "এই স্মার্ট মিষ্টি মেয়েটি কি আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট?"

"প্রায় তাই। শিক্ষানবিশ বলতে পারেন।"

রামেন্দুবাবুর কমপ্লিমেন্ট, দীপকাকুর স্বীকৃতি দিতে কিপ্‌টেমি, দুটোতেই সমান বিব্রত বোধ করে ঝিনুক।

রামেন্দুবাবু বলেন, "ভাল, ভাল। আমেরিকায় দেখেছি গোয়েন্দার অ্যাসিস্ট্যান্ট বেশির ভাগ মহিলারাই হন। আমরা কলকাতার লোকেরা পিছিয়ে থাকব কেন!" একটু থেমে রামেন্দুবাবু আসল প্রসঙ্গে ফিরতে চান, "তা বলুন, আমি আপনাদের কী কাজে লাগতে পারি?"

দীপকাকু শুরু করেন, "আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে খবরটা পেয়েছেন। আপনার বন্ধু ডক্টর বিপুল নন্দী বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন।"

"হ্যাঁ, পেয়েছি। ওর বড়ছেলে ফোন করেছিল আমায়। জানতে চাইল, বিপুল আমার কাছে আছে কিনা। বলার পর চোখ নামিয়ে নেন রামেন্দুবাবু, মন খারাপের গলায় বলেন, "ভেরি স্যাড, বিপুল যে এরকম একটা কাণ্ড করবে ভাবতে পারিনি।"

কথাটা খচ করে কানে লাগল ঝিনুকের, রামেন্দুবাবু কি অন্য কোনওরকম কাণ্ডের প্রত্যাশা করছিলেন? দীপকাকুর প্রতিক্রিয়া সম্ভবত একই, সেই কারণে হয়তো ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "আপনার বন্ধু কি খামখেয়ালি? কখন কী কাণ্ড করে বসেন কোনও ঠিক নেই?

"না, তেমনটা নয়। আসলে ও অনেক বদলে গেছে।"

"কীরকম? জানতে চান দীপকাকু। রামেন্দুবাবুর মুখে চিন্তা ঘনায়। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করেন। সেই বিদেশি সিগারেট, যার ফিল্টার পাওয়া গিয়েছিল ডক্টর নন্দীর ঘরের অ্যাশট্রেতে। দীপকাকুর দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে দেন রামেন্দুবাবু।

দু'জনেই সিগারেট ধরান। রামেন্দুবাবু বলতে থাকেন, "আমার প্ল্যান ছিল রিটায়ার্ড লাইফটা কলকাতায় নিজের বাড়ি ফিরে এসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে কাটাব। বিয়ে-থা করিনি, কোনও পোষ্য নেই। বন্ধুরা আমার কাছে অনেকখানি। কিন্তু কোথায় কী, এখানে ফিরে দু'-তিনটে পুরনো বন্ধুকে পেলাম। বাকিরা নয় মারা গিয়েছে অথবা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে অন্য কোথাও। আমার পুরনো বন্ধুদের মধ্যে বিপুল ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি আমরা।"

"হ্যাঁ, সেটা ওঁর বড়ছেলে আমাদের বলেছেন।" বললেন দীপকাকু।

রামেন্দুবাবু ফের বলতে থাকেন, "কলকাতায় চলে আসার পর বেশ কয়েকবার ওর বাড়ি গেলাম, সেই আগের বিপুল নেই। খুব হাসিখুশি ইয়ারবাজ ছিল।"

"বদলের কারণ হিসেবে আপনার কী মনে হয়?" জানতে চান দীপকাকু।

রামেন্দুবাবু বলেন, "আন্দাজ করা মুশকিল। বাড়ির লোকের সঙ্গেই ভাল করে কথা বলত না বিপুল। আমি গেলে এড়িয়ে যেত।"

"কোনও মেন্টাল প্রবলেম?"

"হলেও হতে পারে। তবে সেটা পুরোপুরি মানসিক রোগ নয়। অত্যধিক ব্লাডসুগার আছে ওর, উপসর্গ হিসেবে কিছু মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।"

রামেন্দুবাবুর কথার পিঠে দীপকাকু বলেন, "তার একটা প্রমাণ অবশ্য উনি রেখে গেছেন। নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে বাড়ির লোকের উদ্দেশে লেখা একটা চিঠি। খুবই এলোমেলো ভাষা।"

"ও, তাই নাকি? এটা অবশ্য অমিতেশ আমাকে জানায়নি। ফোনে আর কত কথাই বা বলবে। আমারই একবার ওদের বাড়ি যাওয়া উচিত। বলে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের শেষ অংশ গুঁজে দেন রামেন্দুবাবু। মৌজ করে দুটো টান মেরে দীপকাকুও তাই করেন। হঠাৎই ঘরের তিনজনকে চমকে দিয়ে বাসন পড়ার শব্দ ভেসে আসে ভিতর বাড়ি থেকে। বিরক্তির ভাঁজ পড়ে রামেন্দুবাবুর মুখে। হাঁক পাড়েন, "সনাতন! সনাতন!"

একটু পরে সনাতন, মানে কাজের লোকটি দরজায় এসে দাঁড়ায়। রামেন্দুবাবু ধমক দেন, "ফের বাসন ফেললি!"

কাঁচুমাচু মুখে সনাতন বলে, "আমি নই, বিড়াল।"

এক পরদা গলা তুলে রামেন্দুবাবু বলেন, "সবসময় বিড়ালটার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস, ওটা তোর চেয়ে অনেক স্মার্ট।"

রসিকতা শুনে আর-একটু হলে হেসে ফেলছিল ঝিনুক। রামেন্দুবাবু ফের ধমকে বলে ওঠেন, "বাবুরা কতক্ষণ হল এসেছেন, চা-টা কিছু দিলি না তো!"

দীপকাকু বারণ করতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই আদেশ নিয়ে সনাতন চলে গেছে। আবার আগের কথায় ফিরে আসেন দীপকাকু, "ডক্টর নন্দী কি কোনও বিষয়ে রিসার্চ করছিলেন বলে আপনার মনে হয়? মানে, আলোচনা টালোচনা করেছিলেন আপনার সঙ্গে?"

"রিসার্চ করলেও করতে পারে। আমার সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন হবে না। দু'জনের সাবজেক্ট গোড়ায় এক হলেও, পরের দিকে আলাদা। আমি কাজ করেছি মানুষের কোষ নিয়ে, বিপুল উদ্ভিদের।" বলে কী যেন একটু ভেবে নিলেন রামেন্দুবাবু। তারপর বললেন, "একটা তথ্য আপনাকে আমি দিতে পারি।"

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক নিজের নোটবুক বার করে ফেলল, অনেকক্ষণ কোনও নোট নেওয়া হয়নি। রামেন্দুবাবু বলতে থাকেন, "এক কবিরাজের সঙ্গে বিপুলের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। কারণটা আমি জানি না। সম্পর্কটা ইদানীং একটু তিক্ত হয়েছিল, সেটা টের পাই হঠাৎ একদিন বিপুলের বাড়ি গিয়ে। ঘরের বাইরে থেকে শুনছিলাম কোনও একটা ব্যাপার নিয়ে ওরা দু'জনে খুব ঝগড়া করছে। আমি ঘরে ঢুকতেই চুপ করে গেল। বুঝলাম সিক্রেট কিছু। কবিরাজ চলে যেতে বিপুলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল?' 'ও কিছু না' বলে এড়িয়ে গেল বিপুল। সত্যি কথা বলতে কী, তারপর থেকে বিপুলের উপর আমার একটু রাগই হয়ে যায়। আর ওর বাড়ি যাইনি।" থামলেন রামেন্দুবাবু, হঠাৎ মনে পড়েছে এভাবে বলে ওঠেন, "হ্যাঁ, আর-একটা কথা। কবিরাজ লোকটিকে আমার সাধারণ

মানের পর্যবেক্ষণে বেশ ধড়িবাজ বলেই মনে হয়েছে। ওর উসকানিতে বিপুল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। আপনারা পারলে একবার কবিরাজের সঙ্গে দেখা করে নিন।"

তিন কাপ চা, বিস্কুট, চানাচুর, অনেক কিছু নিয়ে এল সনাতন। ঝিনুক ঠিক করে, খেয়েই নেবে চা, কত আর লোকের বাড়ি গিয়ে বলা যায়, খাই না।

চা খেতে খেতে খোশ গল্পে মেতে গেলেন দীপকাকু। রামেন্দুবাবুর কাছে জানতে চাইলেন, বিদেশে কোথায় কোথায় গিয়েছেন, ভারতের কোন রাজ্য, শহর সবচেয়ে ভাল লাগে? ... ঝিনুক অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। অচেনা পাখির ডাক ভেসে আসছে বাগান থেকে। এত বড় বাড়িটা ভীষণ নিঝুম লাগে। সনাতন আর রামেন্দুবাবু ছাড়া আর কেউ থাকে না বলেই মনে হয়। এই ধরনের বাড়িতে থাকতে হলে ভারী বিরক্ত লাগবে ঝিনুকের।

"আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টের বয়স কিন্তু খুবই অল্প। ইনটেলিজেন্সি কেমন?"

রামেন্দুবাবুর কথায় সংবিৎ ফেরে ঝিনুকের। মিটিমিটি হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছেন ঝিনুকের দিকে। বললেন, "ছোট্ট একটা অঙ্কের পরীক্ষা নিই?"

ঝিনুকের ভীষণ অস্বস্তি লাগে। একই সঙ্গে নার্ভাস। এ কী অন্যায় কথা, এসেছে বিপুল নন্দীর অন্তর্ধানের কারণ অনুসন্ধানে, খামোখা তাকে পরীক্ষা দিতে হবে কেন? কোন কথা প্রসঙ্গে পরীক্ষার ব্যাপারটা এল কে জানে!

"তোমাকে আমি একটা আশ্চর্য যোগ করা দেখাব। প্রথমেই বলে দিচ্ছি যোগফল ১৯৯৮। নোটবুকে লিখে নাও।"

এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই, যোগফলটা লেখে

ঝিনুক। অঙ্কে সে খুব একটা খারাপ নম্বর পায় না। এখনই হার মানবে কেন!

"তুমি তিন অঙ্কের একটা সংখ্যা বলো।" বলেন রামেন্দুবাবু।

ঝিনুক বলে, "৩১৫।"

"লিখে ফেলো। তার তলায় লেখো ৬৮৪, এটা আমার সংখ্যা।"

ঝিনুক লিখে নেয়। রামেন্দুবাবু বলেন, "আবার তিন অঙ্কের একটা সংখ্যা বলো।"

ঝিনুক বলে এবং লিখে নেয়, ৭৯৯।

"ভেরি গুড। আমার সংখ্যা ২০০। এবার যোগ করে দ্যাখো ১৯৯৮ হয় কিনা।"

ঝিনুক যোগ করে দ্যাখে, সত্যিই মিলে গেল। রীতিমতো অবাক হয়েছে ঝিনুক। আত্মতুষ্টির হাসি নিয়ে রামেন্দুবাবু বলেন, "দেখলে, তুমি কী সংখ্যা বলবে আমি তো জানি না, উত্তরটা আগেই বলে দিয়েছিলাম।"

ঝিনুক দীপকাকুর মুখের দিকে তাকায়, এমন বিভোর হয়ে বসে আছেন, যেন এতক্ষণের কথোপকথন কিছুই শুনতে পাননি। হয়তো অভিনয়। অঙ্কের ধাঁধাটা ওঁর বেশ কঠিন ঠেকেছে। দীপকাকুর দিকে তাকিয়ে আছেন রামেন্দুবাবু, মুখের হাসিতে মৃদু চ্যালেঞ্জ।

ঘোর কাটিয়ে ঝিনুকের দিকে তাকান দীপকাকু। বলেন, "১৯৯৮কে ৯৯৯ করে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, তুমি যে তিন অঙ্কের সংখ্যা বলেছ, ৯৯৯ থেকে মাইনাস করে উনি নিজের সংখ্যা বলেছেন। দু'বার শূন্যস্থান পূরণ করে উনি পৌঁছে গেছেন ১৯৯৮-এ।"

ঝট করে হিসেবটা কষে নিয়ে ঝিনুক অবাক। রামেন্দুবাবুও উচ্ছ্বসিত। বলেন, "ধাঁধাটা আপনি জানতেন?"

মাথা নেড়ে 'না' বলেন দীপকাকু। ফের অন্যমনস্ক হতে হতে বলেন, "শূন্যস্থান পূরণ!"

ঝিনুকরা বেরিয়ে এসেছে রামেন্দুবাবুর বাড়ি থেকে। দীপকাকু গম্ভীর। মেজাজ খিঁচড়ে আছে ঝিনুকের। খামোখা রামেন্দুবাবু তাকে হেনস্তা করলেন। কিছু মানুষ এরকম হন, স্টুডেন্টদের খাপছাড়া প্রশ্ন করে মজা পান খুব। রামেন্দুবাবুর মতো উচ্চশিক্ষিত মানুষের এই রোগ থাকা উচিত নয়।

গাড়ির কাছে পৌঁছে দীপকাকু আর-একবার রামেন্দুবাবুর পুরনো দোতলা বাড়ির দিকে তাকান। গভীরভাবে চিন্তা করছেন কিছু। ধাঁধার উত্তর পারেনি ঝিনুক, ভর্ৎসনা করতেও ভুলে গেছেন।

"চলো, শিয়ালদায় যাওয়া যাক।" বলে গাড়িতে গিয়ে বসলেন দীপকাকু। ঝিনুকও উঠে আসে। ড্রাইভার আশুদার মুখ ব্যাজার। দীপকাকুর সঙ্গে গত অভিযানের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গেছে হয়তো। প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল।

এলগিন রোড ছেড়ে বাঁ দিকে টার্ন নিল আশুদা। ঝিনুক দীপকাকুর কাছে জানতে চায়, "আমরা শিয়ালদায় কেন যাচ্ছি?"

"কবিরাজ নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে।"

ঝিনুকের মনে পড়ে, অমিতেশবাবু অস্পষ্ট একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন কবিরাজের। তার মানে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করতে হবে। রোদ বাড়ছে, কপালে দুঃখ আছে ঝিনুকদের।

জানলার বাইরে ব্যস্ত শহর, ঝকঝকে অফিস, দোকান, অসংখ্য গাড়ি, মানুষ ... সব কিছুই কত স্পষ্ট প্রকাশিত। এর মধ্যে একটা মানুষ অন্তর্হিত হয়ে গেলে, তাকে খুঁজে পাওয়া মুখের কথা নয়। কাজটা ক্রমশ অসাধ্যসাধন মনে হচ্ছে ঝিনুকের। দীপকাকুর মাথায় এখন কী ঘুরছে কে জানে! ঝিনুক অপেক্ষায় আছে দীপকাকুর মোবাইল বেজে ওঠার। দুটো ফোন আসার সম্ভাবনা আছে, অ্যালার্ম ঘড়ির ফরেনসিক রিপোর্ট আর নকল ডাক্তার নন্দীর ফোন। রিপোর্টে যার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে, তাকে ধরলেই তদন্তের দ্রুত নিষ্পত্তি

হবে। রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে ফল্‌স ফোনটার। কোথা থেকে যে লোকটা ঝিনুকদের গতিবিধির উপর নজর রাখছে, বোঝাই যাচ্ছে না। কথাটা খেয়াল হতে গাড়ির পিছনের দিকে তাকায় ঝিনুক, খোঁজে কালো গাড়িটাকে, পায় না। পাশ থেকে দীপকাকু বলে ওঠেন, "তুমি ভুল সন্দেহে গাড়িটাকে তাড়া করেছিলে। ফলো করার হলে অন্য গাড়ি নিয়ে সে এখনও আমাদের পিছু নিত। একটু থেমে বলেন, গাড়ি থেকে নয়, আলাদা কোনও পদ্ধতিতে আমাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে।"

আর কী পদ্ধতি হতে পারে, ভেবে দিশা পায় না ঝিনুক। দীপকাকু ফের বলেন, "এই কেসটা মোটেই তেমন জটিল নয়। মুশকিল হচ্ছে, যাদের সাক্ষ্য নিচ্ছি, তারা কিছু না-কিছু গোপন করে যাচ্ছে। জট পাকিয়ে যাচ্ছে গোটা ব্যাপারটা।"

"কীরকম?" জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, "অমিতেশবাবু চেপে যাচ্ছেন, বাবার সঙ্গে কী নিয়ে তাঁদের মনোমালিন্য হত। ওঁদের বাড়ির কাজের লোক কেশব ভালমানুষ সেজে থাকলেও, অনেক কিছু জানে, বোঝে। আমাদের কাছে সব কথা বলছে না। রামেন্দুবাবু এড়িয়ে গেলেন দরকারি বেশ কিছু তথ্য। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন রাজ্য এবং শহর ওঁর বিশেষ পছন্দ? বললেন, কলকাতা, মুম্বই, দিল্লি ছাড়া অন্য কোনও বড় শহরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। তিনের মধ্যে কলকাতা বেস্ট। অথচ ওঁর বইয়ের র‍্যাকে ওড়িশা নিয়ে প্রচুর বই দেখলাম।" থামেন দীপকাকু। বড় নিশ্বাস ফেলে বলেন, "এখন দেখা যাক নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কতটা কী বলেন! এঁদের সকলের সঙ্গে কথা বলে বিপুল নন্দীর নোটটার কেটে দেওয়া অক্ষরগুলো ফিরিয়ে আনতে হবে। অনেকটা শূন্যস্থান পূরণের মতো।"

রামেন্দুবাবুর বাড়িতে বসে শূন্যস্থান পূরণ কথাটা অঙ্কের প্রসঙ্গে

বলেছিলেন দীপকাকু। একবার রিপিটও করেন। কেন করেছিলেন এখন বুঝতে পারছে ঝিনুক।

দীপকাকুর আক্ষেপ, সবাই কিছু না-কিছু গোপন করছে তাঁকে। উনিও পাত্রবিশেষে তথ্যের রকমফের করছেন। ঝিনুক লক্ষ করেছে, 'বিপুল নন্দী কিডন্যাপ্‌ড হয়েছেন' এই স্থির ধারণার কথা দীপকাকু একবারের জন্যও রামেন্দুবাবুকে বলেননি। ফল্‌স ফোন আসার কথাটাও চেপে গিয়েছেন। যা বোঝা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত বিপুল নন্দীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এমন কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না দীপকাকু। এদিকে রামেন্দুবাবু সন্দেহের তির কবিরাজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। লোকটা নাকি ভীষণ ধড়িবাজ। কল্পনায় ধড়িবাজ কবিরাজের ছবিটা আঁকতে গিয়ে ঝিনুক দ্যাখে, মোবাইল বের করে দীপকাকু নম্বর টিপছেন। কানে নিলেন ফোনসেট। একটু পরে বললেন, "কানেকশন অফ করে দিয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক।"

ঝিনুক আন্দাজ করতে পারে, দীপকাকু ফল্‌স কলারের নম্বরে ডায়াল করেছেন। শেষ ফোনের নম্বর সেভ করে রেখেছিলেন দীপকাকু।

আরও দু'-তিনবার ট্রাই করলেন নম্বরটা। ফলাফল একই। দীপকাকু এবার ফোন করলেন লালবাজার কন্ট্রোলে। এক চান্সেই পাওয়া গেল রঞ্জনকাকুকে। নম্বরটা দিয়ে দীপকাকু বললেন, "যত তাড়াতাড়ি পারিস ফোন কোম্পানি থেকে নম্বরটা আইডেন্টিফাই কর। লাস্ট ফোন কোথা থেকে করা হয়েছিল, সেটাও খবর নে।"

নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের চেম্বার খুঁজে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হল না। শিয়ালদা ফ্লাইওভারের নীচে একটা অন্ধকার গলির ভিতর ঘুপচি ঘর। চেম্বারে একটি মাত্র পেশেন্ট।

রুগির চেয়ে ডাক্তারের চেহারা বেশি ঝিমোনো। পান খাওয়া

লাল ঠোঁট, টিকলো নাক, ইট-চাপা ঘাসের মতো ফরসা মানুষটাকে দেখে, টিয়াপাখির তুলনা মনে আসে। ঝিনুকরা ঘরে ঢুকতেই নারায়ণবাবু চশমার উপর দিয়ে একবার দেখলেন। কিছু বললেন না। ফের মন দিলেন রুগি দেখায়। ওঁর দৃষ্টি বুদ্ধিদীপ্ত এবং ক্ষুরধার।

দেওয়ালঘেঁষা বেঞ্চে বসল ঝিনুকরা। ঘরটা এতই অন্ধকার দিনের বেলায় বাল্‌ব জ্বালাতে হয়েছে। হলদেটে আলোয় কেমন যেন ছমছমে ভাব। ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধ, কালচে ফার্নিচার, দরজা জানলার প্যাটার্ন সবই পুরনো দিনের। সশব্দে ঘুরছে কার্জন আমলের সিলিং ফ্যান, যেন অতীতের কথা বলছে।

একমাত্র পেশেন্টটি উঠে যেতে দীপকাকু গিয়ে বসেন চেয়ারে। ঝিনুক পাশে দাঁড়ায়। কবিরাজমশাইয়ের টেবিলে কোনও ফোন নেই। থাকলে বেমানান লাগত। ধরে নেওয়াই যায়, বিপুল নন্দীর হারিয়ে যাওয়ার খবর এঁর কাছে পৌঁছোয়নি।

নারায়ণবাবু একইরকমভাবে চশমার উপর দিয়ে ঠায় তাকিয়ে আছেন ঝিনুকদের দিকে। দীপকাকু সবিনয়ে নিজের পরিচয় দেন, বিপুল নন্দীর অন্তর্ধানের কথাটা বলেন। নারায়ণবাবু যে পোড় খাওয়া লোক, তা বোঝা যায়। দীপকাকুর সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনে নিরুত্তাপ গলায় বললেন, "বিপুল নন্দীকে পাওয়া যাচ্ছে না তো আমি কী করব! আপনারা আমার কাছে এসেছেন কেন?"

"যদি আপনি কোনও হদিশ দিতে পারেন। আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ওঁর।" বললেন দীপকাকু।

উত্তরে নারায়ণবাবু বলেন, "সম্পর্ক একটা ছিল ঠিকই, তেমন গভীর কিছু নয়। উনি গাছপালা নিয়ে পড়াশোনা করেন, মাঝেমধ্যে আমার কাছে আলোচনা করতে আসতেন। ব্যস, এই পর্যন্ত।"

সঙ্গেসঙ্গে দীপকাকুর কুটিল প্রশ্নবাণ, "আপনিও যেতেন ডক্টর নন্দীর বাড়ি, সেটাও কি ওঁরই প্রয়োজনে?"

নির্বিকার ভাবটা ধরে রাখতে পারলেন না নরনারায়ণবাবু। কপালে ভাঁজ পড়ল। সতর্ক কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "বিপুলবাবু গাছের বীজ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, বাগানে সংকর জাতীয় কিছু উদ্ভিদের চাষ করেছিলেন। সেসব দেখতেই ডেকে পাঠাতেন আমাকে।"

"ওঁর গবেষণার বিষয়টা কী ছিল?"

"সেটা আমায় কখনও বলেননি।"

"আপনি কি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছিলেন?"

"না।"

নরনারায়ণ কবিরাজের উত্তর শুনে গুম মেরে গেলেন দীপকাকু। একটু সময় নিয়ে আক্রমণাত্মক অথচ ঠান্ডা গলায় বললেন, "আপনি সত্যি কথা বলছেন না। এতবার আপনার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, এমনকী ঝগড়াও হয়েছে কখনও কখনও, কিছুই আন্দাজ করতে পারেননি, এটা হতে পারে না।"

দীপকাকুর কথায় রেগে যাওয়ার বদলে একটু যেন উদাস হয়ে গেলেন নরনারায়ণবাবু। শূন্যে দৃষ্টি রেখে বললেন, "সত্যি বলতে কী, বিপুলবাবুর গবেষণার বিষয় নিয়ে যে ধারণা আমার হয়েছে, তা এতটাই অবান্তর, অবাস্তব, নিজেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি।"

"কীরকম?" কৌতূহলী হন দীপকাকু।

নরনারায়ণ কবিরাজ বলতে থাকেন, "আমার মনে হয় উনি এমন কোনও গাছের সন্ধানে ছিলেন, যার পাতা, ফল অথবা ফুল কোনও একটা থেকে আলো বের হয়।"

কথাটা শুনে মনের ভিতর প্রবল ঝাঁকুনি খায় ঝিনুক, এ কী আশ্চর্য গাছের খোঁজে ছিলেন ডক্টর নন্দী!

দীপকাকু অতটা চমকাননি। জানতে চাইলেন, "ওরকম

কোনও গাছ পৃথিবীতে কখনও ছিল, নাকি উদ্ভিদকোষে পরীক্ষা করে উনি সৃষ্টি করতে চাইছিলেন?"

"আমি জানি না। যতটুকু বললাম তার চেয়ে বেশি আর কিছুই জানতে পারিনি।" বলে প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাইলেন নরনারায়ণবাবু।

দীপকাকু সহজে ছাড়ার পাত্র নন। জিজ্ঞেস করেন, "উনি যেসব গাছ, বীজ নিয়ে গবেষণা করতেন, সেগুলো দেশি না বিদেশি?"

"সবই এদেশি। প্রধানত বিহার, বাংলা, ওড়িশার গাছপালা নিয়ে কাজ করতেন।"

"কোন ধরনের গাছ? বৃক্ষ, গুল্ম, নাকি লতানে?"

"মিলিয়ে মিশিয়ে। এতরকম গাছ, নাম বললে আপনি সব চিনতে পারবেন না।"

"যেগুলো পারব, সেগুলো অন্তত বলুন।"

"পেঁপে, কুমড়ো, গাজর, আমলকী, আম ... বলতে বলতে থেমে গেলেন নরনারায়ণবাবু। মাথার উপর পুরনো আমলের ফ্যানটা ঘটরঘটর শব্দে ঘুরে চলেছে, হাওয়া লাগছে না গায়ে।

কী একটু ভেবে নিয়ে দীপকাকু জানতে চাইলেন, "যেসব উদ্ভিদ নিয়ে উনি কাজ করতেন, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও যোগসূত্র আছে। সেটা কী?

এবার স্পষ্ট বিরক্ত হলেন নরনারায়ণবাবু। আচমকা দীপকাকুকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি বোটানিক্যাল গার্ডেনে জীবনে ক'বার গিয়েছেন?"

দীপকাকু চুপ করে থাকেন। প্রশ্নটা যে আসলে বিদ্রুপ, সহজেই বোঝা যায়। নরনারায়ণবাবু নিজেই উত্তরটা দেন। বলেন, "নিশ্চয়ই তিন-চারবারের বেশি নয়। গাছপালা বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই আপনার। তদন্তের স্বার্থে সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা

করছেন। উদ্ভিদ জগৎ হচ্ছে অনন্ত সমুদ্র। দু'-চার কথায়, ফাঁকিবাজি করে সবটা কি বোঝা সম্ভব?"

মুখের ভাব বদলে গেল দীপকাকুর, যারপরনাই অপমানিত হয়েছেন। একটু সময় নিয়ে পালটা আক্রমণে যান, "আপনার জ্ঞান অগাধ হতে পারে। পসারের কোনও উন্নতি হয়নি। ডিসপেন্সারির অবস্থা এবং এখন অবধি একটিমাত্র পেশেন্ট দেখে সেটা বোঝা যায়।"

ম্লান হয়ে গেল নরনারায়ণবাবুর চেহারা। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, "কলকাতায় এত কবিরাজ থাকতে আপনাদের ডক্টর নন্দী কিন্তু আমার কাছেই আসতেন।"

"এটা আপনি মোক্ষম কথা বলেছেন। এই ধন্ধটাই এখন অবধি আমার কাটল না।" বললেন দীপকাকু।

নরনারায়ণবাবু চলে গিয়েছেন ওষুধের আলমারির সামনে। একটা শিশি তুলে নিয়ে ফিরে এলেন চেয়ারে।

ঝিনুক তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে শিশির উপর, লেবেলহীন, সাদা মলম মতো কী যেন আছে ভিতরে। আঙুল ঢুকিয়ে কিছুটা মলম বের করে আনলেন নরনারায়ণবাবু। দীপকাকুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, "এই ওষুধটা আমি তৈরি করেছি। কপালে, চোখের পাতায়, নাকের নীচে লাগিয়ে নিন, মাথা ভাল কাজ করবে।"

ঝিনুক আশ্চর্য হয়ে দ্যাখে, দীপকাকু নির্দ্বিধায় মলমটা নিয়ে নরনারায়ণবাবুর নির্দেশমতো লাগিয়ে নিলেন! তদন্তের কিনারা করতে না পেরে কি দীপকাকুর মাথার অবস্থা এতটাই কাহিল! এভাবে অনুগ্রহ নেওয়াটা মোটেই ভাল লাগে না ঝিনুকের। ঠিক এই সময় মনে পড়ে রামেন্দুবাবুর সতর্কবাণী, 'কবিরাজ লোকটা মহা ধড়িবাজ'। আশঙ্কিত হয়ে ঝিনুক ফের দীপকাকুকে লক্ষ করে, চেয়ারে ঘাড় হেলিয়ে চেয়ে আছেন সিলিংয়ের দিকে। কীরকম যেন

গা-ছাড়া ভাব। একটু পরেই প্রায় নাক ডাকার কাছাকাছি নিশ্বাস ফেলতে থাকেন। জেগে ঘুমিয়ে গেলেন নাকি? ভয়পাওয়া গলায় ঝিনুক ডাকে, "দীপকাকু! দীপকাকু!"

"উঁ" বলে সাড়া দেন শুধু। রকমসকম সুবিধের লাগে না ঝিনুকের। নরনারায়ণবাবুর দিকে কড়া চোখে তাকায়। মিটিমিটি হাসছেন কবিরাজ। ঝিনুক ঝাঁঝিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে দীপকাকুর? কী ওষুধ দিলেন?"

খুবই তাচ্ছিল্যের স্বরে নরনারায়ণ কবিরাজ বলেন, "কিছুই না। পাঁচ মিনিট এরকম থাকবেন। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার বিদ্যা নিয়ে উনি কটাক্ষ করছিলেন না, সামান্য নমুনা দেখালাম।"

রাগের চোটে মাথা ঝনঝন করছে ঝিনুকের, মনে হচ্ছে নরনারায়ণবাবুকে মার্শাল আর্টের নমুনা দেখালে কেমন হয়। ওঁর শীর্ণ চেহারা দেখে ভয় করে, যদি মরে যান!

"ডাক্তারবাবু আসব?" দোরগোড়ায় কার যেন গলা। ঘুরে তাকায় ঝিনুক, মলিন চেহারার একটা লোক। হয়তো রুগি।

নরনারায়ণবাবু ডাকেন, "আসুন।" তারপর ঝিনুককে বলেন, "তোমরা এখন আসতে পারো।"

বিস্ময়ের গলায় ঝিনুক বলে, "সেকী, এই অবস্থায় দীপকাকু কী করে যাবেন?"

"অনায়াসে যেতে পারবেন। দেখবে?" বলে নরনারায়ণবাবু দীপকাকুকে বলেন, "ও মশাই, এবার তো আপনাদের উঠতে হয়। আমার অন্য কাজ আছে।"

এককথায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন দীপকাকু। মুখে-চোখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। দরজার দিকে ঘুরে গিয়ে হাঁটতে থাকেন। স্টেপিংটা যা একটু এলোমেলো পড়ছে। ঘুম চোখে মানুষ যেমন হাঁটে।

ঝিনুক দৌড়ে গিয়ে দীপকাকুর হাত ধরে নেয়। পিছনে খুকখুকে হাসির শব্দ, নিশ্চয়ই নরনারায়ণবাবুর।

আধাজাগ্রত দীপকাকুকে নিয়ে গলি পার হল ঝিনুক। ওষুধের ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধ নাকে আসছে। বড় ভয় করছে ঝিনুকের, ডোজ় বেশি হয়ে যায়নি তো? কখন সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরবে কে জানে!

গাড়ির কাছাকাছি যেতেই আশুদা দৌড়ে আসে। দীপকাকুর ভ্যাবলা ভাবটা ওর চোখেও পড়েছে।

আশুদার সাহায্য নিয়ে দীপকাকুকে গাড়ির সিটে বসাল ঝিনুক। ঘোর এতটুকু কাটেনি। এই সময় এমন একটা কথা বলল আশুদা, হাসার বদলে রেগে গেল ঝিনুক। আশুদা বলে কিনা, "উনি কি দাঁত তুলে এলেন দিদিমণি?"

প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে জানলার বাইরে তাকিয়ে ঝিনুক দ্রুত ভাবতে থাকে দীপকাকুকে নিয়ে এখন কী করা যায়?

হঠাৎ মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। দীপকাকুর বুক পকেটের দিকে চোখ যায় ঝিনুকের। ওখানেই আছে ফোনসেট। দীপকাকুর কোনও হেলদোল নেই। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফোন আসার কথা আছে। ফোন তুলে কী বলবে ঝিনুক! ভাবতে ভাবতে দীপকাকুর পকেট থেকে সেটটা বের করে নেয় ঝিনুক। নম্বরটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুর্ভাবনা যায় উবে। সুইচ টিপে কানে ফোন লাগিয়ে ঝিনুক বলে ওঠে, "বাবা!"

তড়িৎগতিতে একটা হাত এসে ছিনিয়ে নেয় ফোনসেট। হাতটা দীপকাকুর। সোজা হয়ে বসেছেন। ফোনে বাবাকে বলেন, "রজতদা, আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, ঘণ্টাদুয়েক পর ফোন করুন।"

ওষুধের প্রভাব কেটে গিয়েছে। দীপকাকু এখন সজাগ। ফোন কেটে কপালে ভাঁজ ফেলে বসে আছেন। ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছিল আপনার?"

উত্তরে দীপকাকু বলেন, "নরনারায়ণ কবিরাজের ওষুধ বেশ ভালই কাজ করে দেখলাম। চিন্তাভাবনাগুলো জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল এতক্ষণ।"

"আপনি এই সময়টা চিন্তার জগতে ছিলেন!" অবাক কণ্ঠে বলে ওঠে ঝিনুক।

"ইয়েস। এবং আমি এখন বেশ কিছু সূত্রের মোটামুটি একটা মানে করতে পারছি।"

"যেমন?" জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, "নম্বর ওয়ান, ডক্টর নন্দীর কেসের সঙ্গে ওড়িশা রাজ্য জড়িয়ে আছে।"

প্রায় আকাশ থেকে পড়ে ঝিনুক। মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, "ঠিক বুঝলাম না।"

দীপকাকু বলতে থাকেন, "রামেন্দুবাবুর বুককেসে ওড়িশার আদিবাসী ও ভূপ্রকৃতি বিষয়ক বই দেখলাম। নরনারায়ণ কবিরাজ বললেন, বিপুল নন্দী বাংলা, বিহার, ওড়িশার গাছ নিয়ে গবেষণা করতেন। এবং সব শেষে বিপুলবাবুর কাজের লোক লালু ওড়িশার লোক। সে এখন দেশে ফিরে গিয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সব ক্ষেত্রেই কমন থেকে যাচ্ছে এই রাজ্যটা। নম্বর টু, যেসব গাছ নিয়ে গবেষণা করছিলেন ডক্টর নন্দী, ফলগুলোর রং হলুদ। শুধু আমলকী বাদে। তা হলে এটাও বোঝা যাচ্ছে, ওঁর গবেষণায় হলুদ ফলটা কমন। এখন দেখতে হবে, ওড়িশার ভূপ্রকৃতি এবং হলুদ রং বায়োটেকনোলজির ক্ষেত্রে কতটা ও কী কারণে জড়িত।"

"এ বিষয়ে আমরা কোনও বায়োটেকনোলজিস্টের সঙ্গে কথা বলতে পারি।" পরামর্শ দেয় ঝিনুক।

"সমস্যা আছে। ডক্টর নন্দী যদি নিজের এক্সপেরিমেন্টে অনেক দূর এগিয়ে থাকেন, তাঁর কাজকর্মগুলো অন্য কারও হাতে তুলে

দেওয়া ঠিক হবে না। অপর বিজ্ঞানী বাকি কাজটুকু করে আবিষ্কারটা নিজের বলে চালিয়ে দেবে। সেই কারণেই ফ্লপিগুলো বাপ্পার কম্পিউটারে ফেলে নিজেই দেখেছি। আরও একবার ইন্টারনেট খুলে খুঁজতে হবে হলুদ ফলের গুণাগুণ।"

দীপকাকুর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না ঝিনুক। হলুদ রঙের ফল, ওড়িশা, এসবের সঙ্গে ডক্টর নন্দীর অন্তর্ধানের কী সম্পর্ক কে জানে! গোটাটাই কেমন যেন সংকেতময়। আপশোস হয় ঝিনুকের, সেও যদি নরনারায়ণ কবিরাজের ওষুধ খানিকটা লাগিয়ে নিত, বিষয়টা ধরতে পারত সহজেই।

দীপকাকু অনেকক্ষণ চুপ করে আছেন দেখে, ঝিনুক মুখের দিকে তাকায়, এ মা, নিজের মনেই মিচকি মিচকি হাসছেন!

"কী হল, হাসছেন যে বড়!" বলে ঝিনুক। হাসি চওড়া করে দীপকাকু বলেন, "এই কেসের আর-একটা জট প্রায় খুলে ফেলেছি।"

ঝিনুক প্রশ্ন না করে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকে। দীপকাকু জানতে চান, "আলো ঠিকরোনো গাছ সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা? এটা কোনও আষাঢ়ে গল্প নাকি সত্যিই ওরকম কোনও গাছের সন্ধানে অথবা সৃষ্টিতে ব্যস্ত ছিলেন বিপুল নন্দী?"

"অবশ্যই বোগাস গল্প। নরনারায়ণবাবু আমাদের কনফিউজ় করতে গল্পটা ফেঁদেছেন।" ঝিনুক তার মতামত জানায়।

মাথা নাড়েন দীপকাকু। একটু চুপ থেকে বলেন, "নরনারায়ণবাবু মোটামুটি ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছেন, ডক্টর নন্দী কী নিয়ে রিসার্চ করছেন। আমাদের সেটা বলেননি। আলো ঠিকরোনো গাছের ব্যাপারে নরনারায়ণবাবু নিজে এতটাই অন্ধকারে যে, মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন আমাদের। এবং নিশ্চিত ছিলেন, আমরা বিষয়টাকে গুরুত্ব দেব না। আমি কিন্তু দিচ্ছি।

আমার ধারণা ডক্টর নন্দী ওই আশ্চর্য গাছের সন্ধানে ছিলেন।"

"এরকম ধারণা হওয়ার কারণ?" জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু প্যান্টের পকেট থেকে বের করেন পার্স, ভিতর থেকে বেরোয় ডক্টর নন্দীর সেই নোট যেটা ওঁর টেবিলে রাখা ছিল। দীপকাকু বলেন, "দ্যাখো, কী লেখা আছে, 'চললাম। পাহাড়ের ওপারে। যেখানে সর্বদা দিন ... ' কাগজটা ফের পার্সে রেখে, প্যান্টের পকেটে চালান করতে করতে দীপকাকু বলেন, "লাইনগুলো পড়লেই একটা পাহাড়ি উপত্যকা ভেসে ওঠে চোখে। 'যেখানে সর্বদা দিন' বাক্যটা খেয়াল করো, এমন হতেই পারে আলোজ্বলা গাছগুলোর জন্যই সেখানে সর্বদা দিন।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছে ঝিনুক। কী করে এমন যোগসূত্র বের করে ফেললেন দীপকাকু! প্রশংসাটা কি নরনারায়ণ কবিরাজের প্রাপ্য? একই সঙ্গে ঝিনুক খেয়াল করে, সূত্রটা দীপকাকুর ধারণাকে নস্যাৎ করছে। পয়েন্টটা তোলে ঝিনুক, "তা হলে যা বোঝা গেল, বিপুল নন্দী স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়েছেন। পাড়ি দিয়েছেন সেই উপত্যকায়।"

"না। যদি তিনি সত্যিই অভিযানে বেরোতেন, সঙ্গে ছোটখাটো লাগেজ থাকত। জামাকাপড়, ওষুধপত্তর, শেভিং কিট, পেস্ট, ব্রাশ কিছুই নেননি।"

ঝিনুক ভাবে, ঠিকই তো, যুক্তি আছে দীপকাকুর কথায়।

আশুদা স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসে উসখুস করছে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে লাগাতার আলোচনা তার পছন্দ হচ্ছে না। জিজ্ঞেস করে বসে, "এবার কোথায় যেতে হবে?"

ঘড়ি দেখেন দীপকাকু। অধৈর্য হয়ে বলেন, "ফোনগুলো কেন আসছে না বলো তো!"

ঝিনুক সুর মেলায়, "অমিতেশবাবুর কাছ থেকেও তো কোনও

ফোন এল না। ধরে নেওয়া যায়, মুক্তিপণ চেয়ে এখনও অবধি কোনও কল আসেনি।"

"অমিতেশবাবু কোনও কম্মের নন। আমার কার্ডটা হারিয়েছেন। যখন ফোন করেছিলাম, আমার নম্বরটা জেনে রাখলেন না। আমিও কিছু কম যাই না, বলতে ভুলে গেলাম।" দীপকাকুর গলায় বিরক্তি। ফের বলেন, "বেশি চিন্তাভাবনা করলে আমার আবার খিদে পেয়ে যায়। বেশ বেলাও হল, চলো, লাঞ্চটা সেরে নিই।"

কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে আশুদা। জিজ্ঞেস করে, "কোন দিকে যাব?"

"কলেজ স্ট্রিট চলো।" বলেন দীপকাকু। কলেজ স্ট্রিটে লাঞ্চ? সপ্রশ্ন চোখে দীপকাকুর দিকে তাকায় ঝিনুক।

সিটে গা ছেড়ে দিয়ে দীপকাকু বলেন, "কলেজ লাইফে মা সারদা পাইস হোটেলে দুপুরে খেতাম, শুক্তো, মুড়িঘণ্ট, নারকোল দিয়ে ডাল, বড়ির ঝাল, একেবারে মুখে লেগে থাকবে।"

ঝিনুকের মুড অফ হয়ে যায়, এসব রান্না তো বাড়িতেই খায় লোকে। বাইরে এসব খাওয়ার কোনও মানে হয়! আশুদার মুখটাও কেমন যেন ম্যান্তামারা টাইপের হয়ে গেছে।

হোটেলে বসে ঝিনুক দীপকাকুর আসল উদ্দেশ্য টের পেল। ওড়িশার প্রচুর লোক এ হোটেলে কাজ করে, বালাশোর জেলার একজনকে বেছে নিলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওই জেলার সম্বন্ধে জানলেন। সব কথায় মন দিতে পারল না ঝিনুক, রান্নার টেস্ট সত্যিই অসাধারণ। একদিন মাকে নিয়ে এসে খাওয়ানোর কথাও ভাবল ঝিনুক। অনেক পুরনো রেসিপি মনে পড়ে যাবে মায়ের।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে ঝিনুক প্রথমেই দীপকাকুকে প্রশ্ন

করল, "বালাশোর জেলা নিয়ে এত এনকোয়ারি করছিলেন কেন?"

হোটেল থেকে নিয়ে আসা মৌরি মুখে ফেলে দীপকাকু বলেন, "একটু হোমওয়ার্ক করে নিলাম। আমরা এখন যাব বিপুল নন্দীর পাড়ার বন্ধু বিশ্বনাথবাবুর কাছে। উনি ডক্টর নন্দীর সঙ্গে বালাশোর জেলার চাঁদিপুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ডক্টর নন্দীর কাজের লোক লালুকে ওখান থেকেই নিয়ে আসা হয়। ওড়িশার বালাশোরে গিয়ে আর কী কী করেছিলেন ডক্টর নন্দী, বিশ্বনাথবাবু বলতে পারবেন।"

গাড়িতে গিয়ে বসেছে ঝিনুকরা। আশুদাকে ডোভার লেন যাওয়ার কথা বলে চোখ বুজেছেন দীপকাকু। এত টেনশন, কাজের মাঝে কী করে যে ঘুম আসে কে জানে!

ঘুম অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। ফোন বেজে উঠল। জেগে উঠে ফোন কানে নিলেন দীপকাকু। ঝিনুকদের গাড়ি পৌঁছেছে ধর্মতলা ক্রসিংয়ে। চারপাশে বড্ড হইচই। ফোনে দীপকাকু কী কথা বলছেন ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে না।

তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কথোপকথন। একটু নিরাশভাবে ফোনটা পকেটে রাখলেন দীপকাকু। ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "কার ফোন?"

"ফরেনসিক ল্যাবরেটরি থেকে। অ্যালার্ম ঘড়ির সুইচে কোনও হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। বিপুল নন্দীরও না। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, অ্যালার্মের কাঁটা সেট করেছিল অন্য কেউ। খুবই পাকা মাথার লোক সে। সেট করার পর সুইচটা রুমাল দিয়ে মুছে দিয়েছে।"

কথার পিঠে ঝিনুক বলে, "একই সঙ্গে প্রমাণ হল ডক্টর নন্দী নিজের ইচ্ছেয় ভোর পাঁচটায় ওঠেননি। চালাকি করে তাঁকে ওঠানো হয়েছিল।"

ধর্মতলা ক্রসিং পার করে ঝিনুকদের গাড়ি এখন পার্ক স্ট্রিটের দিকে চলেছে। কপাল কুঁচকে কী যেন ভেবে যাচ্ছেন দীপকাকু। হঠাৎই অসহিষ্ণু স্বরে বলে ওঠেন, "রঞ্জনটা যে কেন কলব্যাক করছে না!"

ফের পকেট থেকে ফোনসেট বের করেছেন দীপকাকু, লালবাজারে রঞ্জনকাকুকে ফোন করবেন নিশ্চয়ই। ডক্টর নন্দীর পরিচয় দিয়ে শেষ যে ফোনটা এসেছিল, তার আসল মালিক কে, কোথা থেকে ফোনটা করা হয়েছিল, খোঁজ নিতে বলা হয়েছে।

পাওয়া গেল না রঞ্জনকাকুকে। ফোন অফ করে দীপকাকু রাগের গলায় বলেন, "দরকারের সময় কোথায় যে থাকে!"

ঝিনুক মনেমনে হাসে, খামোখা রাগ দেখাচ্ছেন দীপকাকু। ভাগ্যিস রঞ্জনকাকুর মতো একটা বন্ধু পুলিশে ছিল, কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে।

বারবার ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়াচ্ছে গাড়ি। দীপকাকুর নকল করে সিটে বসে ঘুমোনোর চেষ্টা করে ঝিনুক। চোখ বুজতেই ভেসে ওঠে, অন্ধকার আকাশের প্রেক্ষাপটে আলো জ্বলা অনেক গাছ। আকাশ কালো হলেও, ভূমিতল আলোকোজ্জ্বল। একা হেঁটে যাচ্ছেন ডক্টর নন্দী। মাঝেমাঝে মুখ তুলে দেখছেন গাছগুলোকে, ... তাড়াতাড়ি চোখ খুলে ফেলে ঝিনুক।

ঝিনুকরা এখন বিশ্বনাথ সরকারের বাড়িতে। বাড়িটা চেনানোর জন্য অমিতেশবাবুকে ফোনে ডেকেছিলেন দীপকাকু। ডোভার লেন পোস্ট অফিসের সামনে অমিতেশবাবু অপেক্ষা করছিলেন। ওঁর কাছে খবর পাওয়া যায়, এখন অবধি মুক্তিপণ চেয়ে ওঁদের বাড়িতে কোনও ফোন যায়নি। পুলিশ একবার রুটিন ইনভেস্টিগেশনে

এসেছিল। দীপকাকুর নাম বলা হয়েছে, পুলিশ বলেছে দীপঙ্কর বাগচী কেসটা হ্যান্ডেল করছেন, লালবাজার থেকে জানানো হয়েছে তাঁদের।

বাবার কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না বলে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল অমিতেশবাবুকে। ঝিনুকের মনে হচ্ছিল ভান। এই কেসটাতে কাউকেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। অমিতেশবাবুও অ্যালার্মের কাঁটা সেট করে থাকতে পারেন। কোনও গ্যাং দিয়ে বাবাকে অপহরণ করিয়ে তুলেছেন গোপন ডেরায়। সম্পত্তি লিখিয়ে নেওয়া অথবা গবেষণার তথ্যগুলো জানা তাঁর উদ্দেশ্য।

ডক্টর নন্দীর ছোটছেলের সঙ্গে দেখাই হল না। তিনি আবার কোন প্রকৃতির কে জানে! দীপকাকুও যে ডক্টর নন্দীর ছেলেদের প্রতি খুব-একটা বিশ্বাস রাখতে পারছেন না, বোঝা যায়। বিশ্বনাথবাবুর ড্রয়িংরুমে বসে উনি প্রথমেই ফেরত পাঠালেন অমিতেশবাবুকে। বললেন, "আপনি বাড়ি যান। আমি এখান থেকে বেরিয়ে আপনাদের কাছেই যাব।"

অমিতেশবাবু চলে যেতে বিশ্বনাথবাবুও যেন একটু সহজ হলেন। সামান্য কটাক্ষও করলেন অমিতেশবাবুর প্রতি। বললেন, "এখন বাবা বাবা করে হেদিয়ে মরছে। যখন বাড়ি থাকত বিপুল, একবারের জন্যও তার ঘরে যেত না ছেলেরা।"

দীপকাকু কথাটা কানে নিলেন না। সরাসরি প্রশ্নে চলে গেলেন, "আপনারা রোজই একসঙ্গে মর্নিংওয়াকে বেরোতেন?"

"হ্যাঁ।"

"সদ্য নতুন কোনও সঙ্গী জুটেছিল?"

"না।"

"কত দূর হাঁটতেন?"

"দেশপ্রিয় পার্ক অবধি। ফেরার সময় মাঝেমধ্যেই বাস ধরতাম।"

পরের প্রশ্নে যাওয়ার আগে দীপকাকু কী যেন একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, "ডক্টর নন্দী কি কখনও আপনার কাছে নিরুদ্দেশ হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন?"

"কখনওই না। সে তো এক প্রকার নিজের বাড়িতেই স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিল। নিজের কাজ নিয়েই মশগুল থাকত সবসময়।"

"কী কাজ?" বিষম আগ্রহে জানতে চান দীপকাকু।

নিরাশ করেন বিশ্বনাথবাবু। বলেন, "সেসব আমি বলতে পারব না। সায়েন্স নিয়ে কোনও ইন্টারেস্ট নেই আমার।"

"তা হলে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হত আপনাদের মধ্যে?"

"নানারকম। দেশ, কাল, রাজনীতি, খেলাধুলো, ভগবান, জিনিসের দাম, শীত, বৃষ্টি, ... বিজ্ঞান ছাড়া বিষয় নেই নাকি!"

"তা ঠিক।" বলে চুপ করে গেলেন দীপকাকু। বোঝাই যাচ্ছে, বিজ্ঞান ব্যাপারটা খুব-একটা পছন্দ করেন না বিশ্বনাথবাবু। এঁর কাছে আসাটা কি অর্থহীন হয়ে গেল? ঝিনুককে আশ্বস্ত করে দীপকাকু নতুন উদ্যমে প্রশ্ন শুরু করেন, "আপনারা চাঁদিপুরে নিছক বেড়াতে গিয়েছিলেন, নাকি ডক্টর নন্দী ওখানে গিয়ে বিশেষ কিছু অনুসন্ধান করছিলেন?"

"বেড়াতেই গিয়েছিলাম। যাওয়ার আগে বিপুলকে এ-কথাও বলেছিলাম, কোনও পড়াশোনার কাজ চলবে না। খাবদাব, আর বেড়াব।"

"উনি কি কথা রেখেছিলেন?" জানতে চান দীপকাকু।

"রেখেছিলই বলা যায়। রাতের দিকে একটু পড়াশোনা করত, রাস্তাঘাটে অচেনা গাছপালা চোখে পড়লে নোটবুক বের করে কী সব লিখত।"

আপাতত কোনও প্রশ্নে না গিয়ে দীপকাকু পার্স বের করে বিপুলবাবুর লাস্ট নোটটা বিশ্বনাথবাবুর হাতে দিলেন। বললেন,

"দেখুন তো এই কাগজটা চিনতে পারেন কিনা?"

একটু উলটেপালটে দেখে বিশ্বনাথবাবু বললেন, "এটা তো বিপুলের নোটবুকের পাতা।"

"লেখাটা পড়লেন?"

"হ্যাঁ।"

"কী মনে হল?"

নীচের ঠোঁট উলটে, ভ্রু কুঁচকে বিশ্বনাথবাবু বললেন, "বেশ গড়বড়ে ব্যাপার মনে হচ্ছে।"

"গোলমালটা কোথায়?" জানতে চান দীপকাকু।

বিশ্বনাথবাবু বলেন, "বিপুল মাঝেমধ্যে লালুর সঙ্গে কথা বলত আর নোট নিত। এটা সেরকমই কোনও লেখা, কিন্তু এত কাটাকুটি কেন?"

প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে দীপকাকু জিজ্ঞেস করেন, "লালুর সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলতেন ডক্টর নন্দী?"

"লালুর জীবন-অভিজ্ঞতা নিয়ে। আধা বাংলা, আধা ওড়িয়ায় কথা বলত লালু, বিপুল শুদ্ধ বাংলায় লিখে নিত।"

বিপুলবাবুর নোটটা পার্সে ঢুকিয়ে পকেটে পুরলেন দীপকাকু। তারপর বললেন, "লালুর অভিজ্ঞতা নিয়ে কেন এত আগ্রহ ছিল আপনার বন্ধুর?"

বড় শ্বাস টেনে বিশ্বনাথবাবু বলেন, "তা হলে তো লালুকে কীভাবে পাওয়া গেল সেটা আগে বলতে হয়।"

"প্লিজ় বলুন।" কাতর কৌতূহল দেখান দীপকাকু।

বিশ্বনাথবাবু বলতে থাকেন, "চাঁদিপুরে আমি আর বিপুল একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছি, মাঝিরা মাছ ধরে ফিরেছে। সি-বিচের থেকে একটু দূরে আড়ত। মাঝিরা প্লাস্টিকের বড়বড় ডাব্বায় মাছ নিয়ে জমা করছে। একজনের মাথায় দুটো ডাব্বা দেখে আমরা

অবাক হই। অত ভারী বইছে কী করে!

অন্য মাঝিদের তুলনায় লোকটার চেহারা টানটান, সুগঠিত, অবশ্যই চোখে পড়ার মতো। বিপুল অনেকক্ষণ ধরে লোকটার উপর নজর রাখল। যখনই লোকটা একটু ফাঁকা হয়েছে, বিপুল গেল আলাপ করতে।

"আর আপনি?" কথার মাঝে বলে ওঠেন দীপকাকু।

বিশ্বনাথবাবু বলেন, "আমি যাইনি। বেড়াতে গেলে আমি নেচারের প্রতি আকৃষ্ট থাকি, মানুষের উপর নয়।"

"তারপর বলুন।"

"তারপর আর কী, বিপুলের যা স্বভাব, যখন যেটা নিয়ে পড়বে শেষ না দেখে ছাড়বে না। লুলারামকে নিয়ে এল হোটেলে।"

"লুলারাম কে?" এই প্রশ্নটা ঝিনুকের। বিশ্বনাথবাবু হাসতে হাসতে বলেন, "লুলারামই হচ্ছে লালু। কলকাতায় এসে নামটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল বিপুল।"

"কারণ?" ভ্রু কুঁচকে জানতে চান দীপকাকু।

"বলছি, তার আগে বলে নিই, লালুর কিছু বিশেষ ব্যাপার। ১৯১৩ সাল থেকে বালাশোর জেলার ইতিহাস মোটামুটি জানা ছিল লালুর। দাবি করত, বেশ কিছু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সে। অথচ তাকে দেখে চল্লিশের বেশি মনে হবে না।"

"সে কী!" বিস্ময়ের চোটে বলে ফেলেন দীপকাকু। ঝিনুকেরও একই অবস্থা। বিশ্বনাথবাবু বলে যান, "লালুর হিসেব মতো ওর বয়স দাঁড়ায় একশোর উপর। স্রেফ আজগুবি বলে চালিয়ে দিয়েছিলাম আমরা। প্রমাণ দেখাতে সে আমাদের নিয়ে গেল বুড়িবালামের তীরে, যেখানে ১৯১৫ সালে বাঘাযতীন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। যুদ্ধটা স্বচক্ষে দেখেছিল লালু, বিস্তারিত বিবরণ দেয় আমাদের। বাঘাযতীনের বিশেষ সঙ্গী

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল, সেই জায়গাটাও দেখায় লালু।"

"আপনারা ওর কথা বিশ্বাস করেছিলেন?" জানতে চান দীপকাকু।

"না। তবে এত সুন্দর করে বলছিল, জীবন্ত হয়ে উঠছিল ইতিহাস। আমি আর বিপুল একই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলাম। লালু তার বাবার কাছ থেকে শোনা গল্পগুলো আমাদের বলছে। লালুকে সেকথা বলতে খেপে গেল। মিথ্যে কথা সে নাকি কখনওই বলে না।"একটু দম নিয়ে বিশ্বনাথবাবু বলেন, "আমি আর লালুকে নিয়ে মাথা ঘামালাম না। চাঁদিপুরের প্রকৃতিতে ডুবে গেলাম। বিপুল লালুকে নিয়ে পড়ল, ওদের গ্রামে গেল ..."

কথা কেটে দীপকাকু জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় ওদের গ্রাম?"

"চাঁদিপুর থেকে তিরিশ-চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, পাহাড়ের উপর পঞ্চলিঙ্গেশ্বর বলে একটা তীর্থস্থান আছে, তার কাছাকাছি। গ্রামটার নাম সোনাটোলি।"

"ওদের গ্রাম থেকে কী কী ইনফর্মেশন নিয়ে এলেন ডক্টর নন্দী?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

উত্তরে বিশ্বনাথবাবু বলেন, "সে নিয়ে আমার সঙ্গে বিশদ কিছু আলোচনা হয়নি। বিপুল শুধু আমায় বলেছিল, গ্রামের লোক বিশ্বাস করে লুলারামের বয়স একশোর উপর। এর সঙ্গে আর-একটা ব্যাপার যোগ হল, লুলারামের মাতৃভূমি ওটা নয়, খুব ছোটবেলায় কার সঙ্গে জানি সে ওই আদিবাসী গ্রামে এসেছিল। যদিও সবারই সেটা শোনা ঘটনা, কোনও সাক্ষী বেঁচে নেই।"

বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছে ঝিনুক। দীপকাকু ক্রমশ উৎসাহিত হচ্ছেন। জিজ্ঞেস করেন, "ডক্টর নন্দী কি গ্রামের লোকের কথা মেনে নিলেন?"

"না। ও আমার মতোই ব্যাপারটা আজগুবি গল্প বলে উড়িয়ে দিল। কিন্তু লুলারামকে ছাড়ল না, নিয়ে এল কলকাতায়। খুব পছন্দ করে ফেলেছিল লোকটাকে। নাম পালটে দিল, ওকে বলে দিল, ভুলেও যেন অতীতের গল্প কারও কাছে না করে। আমিও গোটা ঘটনাটা চেপে গেলাম। লুলারাম দিব্যি লালু হয়ে মানিয়ে নিল বিপুলের বাড়িতে। বিপুল ওকে লেখাপড়া শেখাত, আঁকা শেখাত। বিপুলের সমস্ত পার্সোনাল কাজ করত লালু, ও ছিল বিপুলের সর্বক্ষণের সঙ্গী। বাগান করা থেকে ব্যাঙ্কে টাকা তোলা, সব করতে পারত লালু। কিছুদিন হল লালুর জন্য একটা মোবাইল ফোন কিনেছিল বিপুল।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করেন দীপকাকু।

"কোথাও কাজে গিয়ে ফিরতে দেরি করলে টেনশন হত বিপুলের। মোবাইল ফোন কিনে ওকে অপারেট করতে শেখাচ্ছিল সবে, দেশে চলে গেল লালু।"

"কেন গেল?"

"বিপুল বলছিল, ওর নাকি ক'দিন ধরে মনখারাপ করছিল দেশের জন্য। বিপুল হপ্তাদু'য়েকের ছুটি দিয়েছে।"

একটু থেমে বিশ্বনাথবাবু বলেন, "বেচারা ফিরে এসে বাবুকে না দেখলে ভীষণ ভেঙে পড়বে।"

দীপকাকু আর কোনও প্রশ্ন করছেন না। একমনে কী যেন ভেবে যাচ্ছেন। বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি থেকে এখন পর্যন্ত চা-টা কিছু অফার করেনি, করলে মন্দ হত না। ঝিনুকেরই এখন একটু কড়া চা খেতে ইচ্ছে করছে।

বিনা ভূমিকায় উঠে দাঁড়ালেন দীপকাকু। বললেন, "চলি। আপনার বন্ধুর বাড়িতেই যাচ্ছি এখন। পরে আবার আপনাকে আমার দরকার পড়তে পারে।"

"নিশ্চয়ই আসবেন।" বলে, নমস্কার করলেন বিশ্বনাথবাবু। দরজার দিকে এগিয়েও ফিরলেন দীপকাকু। বিশ্বনাথবাবুকে বললেন, "আপনি যেমন লালুর ব্যাপারটা গোপন করে আছেন, থাকবেন। যতদিন না আমি কাউকে বলতে বলছি।"

"ঠিক আছে।" বলে মাথা হেলালেন বিশ্বনাথবাবু।

রাস্তায় এসে দীপকাকু মোবাইল ফোন বের করলেন। চোখ-মুখ ভীষণ সিরিয়াস। নম্বর টিপে কানে দিয়েছেন ফোন। অপর প্রান্তকে পেয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "কী রে, কোথায় থাকিস।"

ঝিনুক বোঝে ওপারে রঞ্জনকাকু। দীপকাকু বলছেন, "জানি। জানি। লোকেশনটা বল, কোথা থেকে ফোন করেছিল?"

....

"ধুস, কী কোম্পানি রে, নাকি পার্টির প্রাইভেসি রাখছে।"

....

"ঠিক আছে। কাটছি। পরে ডিটেলে বলব।" বলে ফোন অফ করলেন দীপকাকু। দৃষ্টি শূন্যে রেখে বললেন, "এখন যা দাঁড়াচ্ছে, আমার আইডিয়া সম্পূর্ণ ভুল।"

"কেন?" খানিক নার্ভাস হয়ে জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, "রঞ্জন বলছে, মোবাইল ফোন নম্বরটা ডক্টর বিপুল নন্দীর নামে আছে। ফোনটা কোথা থেকে করেছিলেন লোকেট করা যাচ্ছে না। অন্য কেউ যে ডক্টর নন্দীর নাম ভাঁড়িয়ে ফোন নেয়নি, তার প্রমাণ একটু আগে আমরা পেয়েছি। বিশ্বনাথবাবু বলেছেন, কিছুদিন হল সেলফোন নিয়েছেন বিপুল নন্দী। অর্থাৎ ডক্টর নন্দী সত্যিই আত্মগোপন করে আছেন। এত বড় ভুল হল আমার!

"তা হলে কী হবে?" হতাশ কণ্ঠে বলে ওঠে ঝিনুক।

দীপকাকু আচমকা হনহন করে হাঁটতে শুরু করে দিলেন। লক্ষ

নিশ্চয়ই ডক্টর নন্দীর বাড়ি। অ্যাডভান্স টাকাটা কি এখনই ফেরত দিয়ে দেবেন অমিতেশবাবুকে?

তেমন কিছু ঘটল না। ডক্টর নন্দীর বাড়ি ঢুকে দীপকাকু প্রথমেই যেতে চাইলেন বিপুল নন্দীর ঘরে। অমিতেশবাবুর সঙ্গে এবার ছোটভাই অম্লানবাবুকে দেখা গেল। দীপকাকুর সঙ্গে ভাইয়ের আলাপ করাতে গিয়েছিলেন অমিতেশবাবু। দীপকাকু গ্রাহ্য করলেন না। ঝিনুকের মনে হল, প্রবল হতাশা থেকেই দীপকাকু এমনটা করছেন। অম্লানবাবুকে একটু পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত ছিল। ছোটছেলেও সন্দেহের তালিকার বাইরে নেই। বিশেষ করে ঝিনুক লক্ষ করছে, এ-বাড়িতে ঢোকার পর থেকে ডক্টর নন্দীর ঘরে আসা পর্যন্ত অম্লানবাবু একটাও কথা বলেননি। হতেই পারে, বাবার মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে অম্লানবাবু কথা বলছিলেন দীপকাকুর সঙ্গে। পাছে দীপকাকু গলাটা চিনে যান, তাই এখন চুপ করে আছেন।

মুশকিল হচ্ছে, দীপকাকুকে এখন কীভাবে বলা যায় কথাটা। ডক্টর নন্দীর ঘরে ঢুকে ঝড়ের গতিতে সার্চ করছেন সব কিছু। গোটা ঘর লন্ডভন্ড করে এখন গিয়েছেন আলমারির কাছে। চাবি লাগানোই আছে, খুলে ফেললেন পাল্লা।

দীপকাকুর মূর্তি দেখে বাড়ির লোক এতটাই ঘাবড়ে গেছে, মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে একে অপরের। বারান্দায় ঝোলানো খাঁচা থেকে চন্দনাটা ডেকে যাচ্ছে, "কে এল রে লালু, কে এল..."

আলমারির সব জিনিস একে-একে মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছেন দীপকাকু। এ-বাড়ির সবচেয়ে ছোট্ট মেম্বার অনির্বাণ এই মুহূর্তে

দীপকাকুর অ্যাসিস্ট্যান্ট। সে এক-দু'বার 'কী খুঁজছ' জিজ্ঞেস করে, চুপ করে গিয়েছে।

অবশেষে দীপকাকু বলে উঠলেন, "পেয়েছি।" প্রায় 'ইউরেকা'র মতো শোনাল কথাটা। ভীষণ কৌতূহলে সবাই তাকিয়ে আছে দীপকাকুর দিকে, কী পেলেন?

দীপকাকু যা বের করলেন, তা দেখে বাড়ির সকলে নিশ্চয়ই হতাশ হল। ঝিনুক হল না। সে জানে, দীপকাকু এখন গভীর জলে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। তদন্তের হাল পুরোপুরি ছাড়েননি।

দীপকাকুর হাতে বেশ কয়েকটা খামে ভরা এক্স-রে প্লেট। এ ছাড়াও কিছু প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট। অমিতেশবাবুকে সেগুলো দেখিয়ে বললেন, "এগুলো কার টেস্ট রিপোর্ট বলতে পারবেন?"

"নিশ্চয়ই বাবার।" বলেন অমিতেশবাবু।

"না। এই দেখুন।" বলে, দীপকাকু দেখান, সমস্ত খামের উপর পেশেন্টের নাম, যে-ডাক্তার রেফার করছেন তাঁর নাম পেন দিয়ে ভাল করে কাটা। শুধু যে-ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষাগুলো হয়েছে, ছাপা নামটা পড়া যাচ্ছে।

ভীষণ অবাক হয়ে অমিতেশবাবু বলেন, "এর মানে?"

"ক্রমশ প্রকাশ্য।" বলে দীপকাকু রিপোর্টগুলো গুছিয়ে নিতে থাকেন। ফের বলেন, "ঘরটা এলোমেলো করে দেওয়ার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। একটু গুছিয়ে নেবেন প্লিজ়। এই রিপোর্টগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি, সময়মতো ফেরত দেব।"

ঝিনুক পৌঁছে গিয়েছে দরজার কাছে। দীপকাকু এগিয়ে আসছেন। অনির্বাণ হঠাৎ দীপকাকুর হাত টেনে ধরে। একটু যেন কান্নাছোঁয়া গলায় বলে, "দাদু কবে আসবে আঙ্কল?"

ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে যায়। দীপকাকুর মুখে কোনও ভাবান্তর হয় না। এখনই কী যেন মনে পড়ল, এই ভঙ্গিতে

অনির্বাণের সামনে হাঁটু মুড়ে বসেন। জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা অনির্বাণ, তুমি যে বলেছিলে দাদু লালুদাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেটা কি তুমি নিজের চোখে দেখেছিলে, নাকি দাদু তোমায় বলেছিল?"

অনির্বাণ একটু সময় নেয় মনে করতে। তারপর বলে, "আমি যখন দাদুকে খালি জিজ্ঞেস করছিলাম, 'লালুদা কোথায়, লালুদা কোথায়?' দাদু বলল, 'তাড়িয়ে দিয়েছি। ব্যাটা সব জিনিস হারিয়ে দেয় আমার। ওকেই হারিয়ে দিলাম।"

"গুড় বয়।" বলে, উঠে দাঁড়ালেন দীপকাকু। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেশবকে খুঁজে বললেন, "তুমি লালুর একটা আঁকা নিয়ে এসো তো তাড়াতাড়ি।"

কেশব ছুটল। দীপকাকু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। চেয়ে রইলেন বিপুল নন্দীর তৈরি করা বাগানটার দিকে। একটু পরে অমিতেশবাবুর উদ্দেশে বলে উঠলেন, "জলটল দিচ্ছেন তো গাছে?"

এমনভাবে বললেন কথাটা, বাড়ির মালিক যেন দীপকাকু। অমিতেশবাবু শশব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেগুলার দেওয়া হচ্ছে।"

লালুর আঁকা পাতা নিয়ে এল কেশব। দীপকাকু মন দিয়ে আর-একবার ড্রয়িংটা দেখতে থাকলেন।

ঝিনুক হঠাৎ খেয়াল করে, তার একদম পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পামেলা, হাসছে। কিছু বলবে মনে হয়। ঝিনুক হাসি বিনিময় করতেই, পামেলা চাপা গলায় বলে, "এবার তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি।"

ভ্রু কুঁচকে যায় ঝিনুকের। হাসি থমকে থাকে ঠোঁটে। পামেলা ফের বলে, "মিশরের রানির চিঠি উদ্ধার তোমরাই করেছিলে। তখন কাগজে ছবি বেরিয়েছিল তোমার, টিভিতেও দেখিয়েছিল।

আমাদের বাড়িতে প্রথমবার যখন এলে, ঠিক মনে করতে পারিনি তোমাকে। বন্ধুদের কাছে বাড়ির ঘটনা, তোমাদের আসার কথা বলতেই, ওরা মনে করিয়ে দিল। দাদুর ব্যাপারটা নিয়ে আমরা খুবই টেনশনে আছি, তবে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমার খুব এক্সাইটিং...”

“চলে এসো ঝিনুক।” দীপকাকুর ডাকে প্রায় পালিয়ে বাঁচে ঝিনুক। মেয়েটা যা গদগদ হয়ে উঠেছিল, আর-একটু হলে অটোগ্রাফ চেয়ে বসত হয়তো।

ডোভার লেন পোস্ট অফিসের কাছে ঝিনুকদের গাড়ি। বেশ খানিকটা হেঁটে আসতে হল। মাঝপথে একটা ফোনবুথে ঢুকেছিলেন দীপকাকু। সঙ্গে মোবাইল ফোন থাকা সত্ত্বেও ফোনবুথে ঢোকা মানে নিজের পরিচয় লুকিয়ে কাউকে ফোন করলেন মনে হয়। এবারে আর কোনও প্রশ্ন করেনি ঝিনুক। সময়মতো দীপকাকু নিজেই বলবেন। ঝিনুক লক্ষ করছে, খানিক আগে হতাশ হয়েও দীপকাকুর তৎপরতা হঠাৎ বেড়ে গেল। তা হলে কি ওই রিপোর্টগুলোর ভিতর লুকিয়ে আছে রহস্যের আশু সমাধান?

গাড়িতে উঠে দীপকাকু বললেন, “আমি গোলপার্কে নেমে যাব। এই রিপোর্টগুলো ওখানকার এক ল্যাবরেটরিতে করানো হয়েছে। তুমি আপাতত বাড়িতে থাকো। প্রয়োজনমতো ডেকে নেব।”

গাড়ি চালু করে দিয়েছে আশুদা। অভিমানী স্বরে ঝিনুক বলে, “আমি যদি আপনার সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে যাই কোনও অসুবিধে হবে?”

“সুবিধে হবে না এটুকু বলতে পারি। ওখানে আমি কতক্ষণ থাকব জানি না। আরও কয়েকটা জায়গায় যেতে হতে পারে। কোথায় কতক্ষণ সময় লাগবে, কোনও ঠিক নেই। তোমার মা ওদিকে চিন্তা করবেন।”

মায়ের কথা উঠতে একটু দমে যায় ঝিনুক। ভেবে ভেবে মা এতক্ষণে বাড়িতে চিন্তার পাহাড় করে ফেলেছেন। এদিকে তদন্ত এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, কৌতূহল দমন করা যাচ্ছে না। ঝিনুক বলে, "ওই রিপোর্টগুলোর মধ্যে আপনি কী খুঁজছেন, জানতে পারি কি? অ্যাটলিস্ট সামান্য হিন্ট?"

"এখনই কিছু বলছি না। সময় হলেই জানতে পারবে। আপাতত একটা ছোট্ট খবর দিই, শুনলে অবাক হয়ে যাবে। এই কেসের আর-একটা জট আমি খুলে ফেলেছি।"

ঝিনুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দীপকাকু মিটিমিটি হেসে বলেন, "ডক্টর নন্দীর শেষ চিঠিতে লেখা ছিল পাহাড়ের কথা। আশ্চর্যের বিষয়, লালু সব ছবিতেই পাহাড় এঁকেছে। কী অদ্ভুত যোগাযোগ, না?"

জট খোলার বদলে পাকিয়ে গেল ঝিনুকের মাথায়। অবুঝ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দীপকাকু বলেন, "বুঝলে কিছু?"

ঝিনুক দু'পাশে ঘাড় নাড়ে। গোল পার্কের কাছে চলে এসেছে ঝিনুকরা। আশুদার পিঠে হাত দিয়ে গাড়ি বাঁ দিকে রাখতে বলেন দীপকাকু। তারপর ঝিনুককে বলেন, "তুমি অনেকেক্ষণ নোট নেওয়া বন্ধ রেখেছ, যা-যা লেখা হয়নি সব নোট করে নাও। পরে ভুলে যাবে। ভাল করে একবার পড়ো। কোথাও কোনও খটকা অথবা মেজর কোনও ক্লু আমরা মিস করে যাচ্ছি কিনা দ্যাখো। তেমন জরুরি মনে হলে তখনই ফোন করবে আমায়।"

দীপকাকু নেমে গেলেন। ঝিনুক যেন অথই জলে পড়ে রইল।

"এবার বাড়ি তো?" বলে গাড়ি স্টার্ট দিল আশুদা। বাইরে কী সুন্দর হলুদ বিকেল। ঝিনুকের বয়সি মেয়েরা ড্রেস করে খোলা মনে এদিকওদিক ঘুরছে। দেশপ্রিয় পার্ক থেকে ভেসে আসছে পাখিদের হইচই। জ্বরো রুগির মতো থম মেরে আছে ঝিনুক। হঠাৎ গা-ঝাড়া

দিয়ে সোজা হয়ে বসে, নাঃ, আর পাঁচটা বন্ধুর চেয়ে আলাদা কিছু করতে চাইলে পরিশ্রমটাও বাড়তি করতে হয়। এখন অবধি এই কেসে ঝিনুকের অবদান বলতে কিছুই নেই। যে-গতিতে এগোচ্ছে তদন্ত, হতেই পারে, কোনও সহজ সমাধান সূত্র ফেলে যাচ্ছে ঝিনুকরা। সেটা খেয়াল করিয়ে দেওয়া হবে ঝিনুকের প্রধান কাজ। কুরিয়ারে ডক্টর নন্দীর চিঠি আসা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে, সব কিছু নিয়ে ভাবতে বসে ঝিনুক।

পরের দিন সকাল। ড্রয়িংরুমে বসে নিউজ়পেপার দ্বিতীয়বার পড়ছে ঝিনুক। কোনও খবরই মাথায় ঢুকছে না। দীপকাকু গোলপার্কে নেমে যাওয়ার পর আর যোগাযোগ করা যায়নি। যখনই দীপকাকুর মোবাইলে ফোন করেছে ঝিনুক, শুনেছে, সুইচ অফ। রাতে বাড়িতে করেছিল। কাজের মাসি বলল, "ঘুমোচ্ছেন। ডাকতে মানা।"

গতকাল সন্ধে থেকে ঝিনুক ছটফট করছে। দুটো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এসেছে তার মাথায়। দীপকাকু সেটা জানলে অবশ্যই তদন্ত সঠিক লক্ষ্যে এগোবে। কিন্তু কোথায় দীপকাকু! এক-এক সময় এমন উধাও হয়ে যান, যেন এই গ্রহের বাইরে চলে গেছেন।

বাবা ঝিনুকের অস্থিরতা টের পেয়ে বলেছেন, "অত অধৈর্য হোস না। দীপঙ্কর সম্ভবত কেসটা সল্‌ভ করে এনেছে। জিনিয়াসদের মতোই শেষ মুহূর্তে গভীর মনোনিবেশ করেছে নিজের কাজে। সেই কারণেই বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছোনোর আগে তোকে অবশ্যই ডেকে নেবে।"

বাবার প্রবোধ বাক্যে কাজ হয়নি। পয়েন্ট দুটো বড়ই খোঁচাচ্ছে ঝিনুককে। দীপকাকুকে না বলে শান্তি পাচ্ছে না।

গত কাল সন্ধেবেলা ডক্টর নন্দীর কেসের সমস্ত ঘটনাই বাবাকে বলেছে ঝিনুক। বাবা মন দিয়ে শুনে অল্প কথায় মন্তব্য করেছেন, "যুগান্তকারী কোনও আবিষ্কারের জন্য আত্মগোপন করেছেন ডক্টর নন্দী। তাঁর কাজে খামোখা বাধা সৃষ্টি করছিস তোরা।"

"যুগান্তকারী কেন বলছ?" জানতে চেয়েছিল ঝিনুক।

বাবা বলেছেন, "ওই যে, প্রথম চিঠিতে ছিল না, 'গোটা মনুষ্যকুল জড়িত'— দ্যাখ, হয়তো ক্যান্সারের ওষুধ বের করে ফেলেছেন।"

বাবার সঙ্গে বেশি আলোচনা করা ঠিক নয়। বাস্তবতার সঙ্গে এমনভাবে কল্পনা মিশিয়ে দেন যে, আলাদা করা যায় না। এই মন নিয়ে বাবা যে কী করে এতদিন মিলিটারিতে কাটিয়েছিলেন, কে জানে! ভাগ্যিস যুদ্ধে যেতে হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় উদ্ধারকার্যে যেতেন।

ঝিনুক একাই এখন কেসের সমস্ত টেনশন নিয়ে বসে আছে। ডক্টর নন্দীও কোনও অজ্ঞাতস্থানে বন্দি হয়ে অপেক্ষা করছেন ঝিনুকদের।

দীপকাকুর পাত্তা নেই দেখে মা খুব আনন্দিত, এখন পর্যন্ত দু'বার বলা হয়ে গেছে, "তোদের এবারের কেসটা খুব ছোটখাটো, না রে? তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল।"

"শেষ হয়নি মা। আমরা নিজেরাই জানি না রহস্য সমাধানে কতটা এগিয়েছি।" বলেছিল ঝিনুক।

তখনই খেয়াল করিয়ে দেন মা, "কাল গানের ক্লাস নিয়ে যেন কোনও রহস্য করতে না দেখি। এই কেসে যাই হয়ে থাক, গানের স্কুল যেন বন্ধ না হয়।"

গান শুনতে খুবই ভালবাসে ঝিনুক, গাইতে একটু-একটু। তবে একগাদা ছাত্রীর মাঝে বসে একটুও গাইতে চায় না। বিশেষ করে যখন কোনও নেকু সাজগোজ করা মেয়ে পাশে বসে বেসুরো গায়।

ফোন বেজে ওঠে। সচকিত হয় ঝিনুক। সোফা ছেড়ে উঠবে কিনা ভাবে। সকাল থেকে চারটে ফোন এসেছে, একটাও তার নয়।

রিং হয়ে যাচ্ছে। উলটো দিকের সোফায় বসে বাবা কী যেন লেখালিখি করছেন। মুখ তুলে বলেন, "যা ধর, মনে হচ্ছে তোর ফোন।"

"কী করে বুঝলে?"

"ইনটিউশন। বহুদিন ধরে ফোনের রিং শুনে এই ক্ষমতাটা আপনিই তৈরি হয়ে যায়। ফোনের আওয়াজের ভিতরে ঢুকে যায় মন। বোঝা যায়, কোনটা নিজের, কোনটা অপরের।"

শুরু হয়ে গেল বাবার জাস্ট-মেড থিয়োরি। ঝিনুক উঠে যায় ফোন ধরতে। সেটের কাছে পৌঁছোনোর আগেই কেটে গেল। অপেক্ষা করে ঝিনুক। ফের বেজে উঠতেই রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলে। অপর প্রান্ত বলে, "কী হল? ফোন ধরতে দেরি হচ্ছে কেন?"

আশ্চর্য, দীপকাকুরই গলা। ঝিনুক বলে, "একটু দূরে ছিলাম।"

"রজতদা অফিস বেরিয়ে গিয়েছেন?"

"না।"

"গাড়িটা নিয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটালের কাছে চলে এসো। কাল যেখানে দাঁড় করিয়েছিলাম। তার খানিকটা আগে রেখো গাড়ি।"

"হঠাৎ?"

"দেখা হলে বলব।"

লাইন কেটে দিতেন দীপকাকু, ঝিনুক 'দাঁড়ান, দাঁড়ান' বলে ওঠে।

"তাড়াতাড়ি বলো।"

"দুটো জরুরি পয়েন্ট মাথায় এসেছে।"

"ক্যারি অন।"

"এক, হতে পারে ডক্টর নন্দী নতুন মোবাইল ফোন কিনেছিলেন,

কিন্তু আপনার নম্বরটা জোগাড় করলেন কী করে? অর্থাৎ আমাদের আগের সিদ্ধান্তই ঠিক ছিল, ফোনটা ডক্টর নন্দী করেননি।"

অপর প্রান্তে দীপকাকু বলেন, "মোটামুটি ঠিক যাচ্ছে। আমি আর-একটা খুচরো পয়েন্ট অ্যাড করছি, সঙ্গে যদি সেলফোন থাকবে, উনি প্রথমবার আমাকে এস টি ডি বুথ থেকে ফোন করেছিলেন কেন?"

ঝিনুক অবশ্য এত গভীরে ভাবেনি। পরের পয়েন্টে যায়, "ডক্টর নন্দীর শেষ নোটে কেটে দেওয়া অক্ষরগুলোর একটা শব্দ আমি বের করতে পেরেছি।"

"কীরকম?"

ঝিনুক বলে, চিঠিতে লেখা ছিল, "চললাম। পাহাড়ের ওপারে। 'পাহাড়ের' আগে একটা শব্দ কাটা হয়েছে। শব্দটা হচ্ছে 'তিন'। তিন পাহাড়ের ওপারে।"

"ভেরি গুড। আমি কাছে না থাকলেই তোমার মাথা ভাল কাজ করে দেখছি।"

প্রশংসা করে এড়িয়ে যাচ্ছেন দীপকাকু, নিজেই মনে হয় ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "বলুন তো কী করে বের করলাম?"

"লালুর আঁকা সব ছবিতেই তিন মাথাওলা পাহাড়।"

ঝিনুক খুবই অস্বস্তিতে পড়ে যায়। ভাগ্যিস দীপকাকু ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছেন না। কোন সাহসে মাপতে গিয়েছিল দীপকাকুর বুদ্ধি! অপর প্রান্ত থেকে দীপকাকু বলেন, "নাউ, গেট রেডি। আধঘণ্টার মধ্যে তোমাকে আমি শম্ভুনাথের কাছে এক্সপেক্ট করছি। ড্রেস আগের দিন যা করেছিলে, তাই যেন থাকে।"

ফোন কেটে দিলেন দীপকাকু। ড্রেসের ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না ঝিনুক।

আধঘণ্টার আগেই আশুদাকে নিয়ে ভবানীপুরে চলে এসেছে ঝিনুক। গাড়ি দাঁড় করানো হয়েছে হসপিটালের মেন গেটের অনেকটা আগে। দীপকাকুর দেখা নেই।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় মা আটকেছিলেন, ঝিনুক বলেছে, "দীপকাকু বোধহয় অসুস্থ। খোঁজ না নিলে খারাপ দেখায়। যাব আর আসব।"

মেয়ের দস্যিপনা যেমন মায়ের অপছন্দ, কিন্তু তিনি দীপকাকুর প্রতি খুবই স্নেহপ্রবণ। তাই আর আপত্তি করেননি।

গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় ঝিনুক। ঘড়ি দেখে চল্লিশ মিনিট হতে চলল। কেন যে হঠাৎ এখানে আসতে বললেন!

আজও একটা কালো অলটো কার এসে দাঁড়াল ঝিনুকদের গাড়ির পিছনে। মুখ ঘুরিয়ে নেয় ঝিনুক। সেই গাড়িটাই যদি হয়, ড্রাইভার ঝিনুককে দেখে হাসবে।

হাসপাতালের কাষদ গাছ থেকে হলুদ ফুল টুপটাপ ঝরে পড়ছে ফুটপাথে। তাকিয়ে থাকে ঝিনুক। হঠাৎ কানে আসে, "এদিকে চলে এসো।"

মুখ তুলে ঝিনুক দ্যাখে, ওপারের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দীপকাকু হাত নেড়ে ডাকছেন।

দু'পাশের গাড়ি দেখে রাস্তা ক্রস করে ঝিনুক। দীপকাকুর সামনে যেতেই, আপাদমস্তক ঝিনুককে একবার দেখেন।

ঝিনুক বুঝতে পারে, ড্রেস দেখছেন। একই সঙ্গে ঝিনুকের চোখে পড়ে, কাবলিজুতোর বদলে দীপকাকুর পায়ে জগিং শু। ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "ড্রেস এক রাখতে বললেন কেন?"

উত্তরে দীপকাকু বলেন, "এখন যে অপারেশনে যাচ্ছি, হাত-পা চালাতে হতে পারে।"

চকিতে শরীরের ভিতর টানটান ভাব চলে আসে ঝিনুকের।

উত্তেজনা চেপে জানতে চায়, "কী ধরনের অপারেশন?"

ফুটপাথে অতিরিক্ত লোক চলাচলের দরুন ধারে সরে যান দীপকাকু। ঝিনুকও এসে দাঁড়ায়। দীপকাকু বলেন, "শোনো, আমার ধারণা রামেন্দুবাবুর বাড়িতেই আছেন ডক্টর নন্দী। তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছে।"

"আপনি শিয়োর?" ভীষণ অবাক হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে ঝিনুক।

দীপকাকু হাত তুলে বলেন, "আস্তে। ধরে নাও নাইনটি পারসেন্ট।"

"কী করে এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন?"

"সেটা বলতে গেলে এখন অনেকটা মূল্যবান সময় খরচ হয়ে যাবে। শুধু এটুকু বলি, কাল যখন আমরা গলির মুখে দাঁড়িয়ে একজনের কাছে রামেন্দুবাবুর বাড়িটা কোথায় জানতে চাইলাম, রামেন্দুবাবু দোতলার জানলা থেকে আমাদের দেখে নিয়ে, আমার মোবাইলে ফোন করেন। হাসপাতালের গেট থেকেও দোতলার জানলাটা দেখা যায়। কাল সেটা আমি লক্ষ করেছি, পয়েন্টটা মাথায় আসেনি।"

"তাই আজ দূরে রাখতে বললেন গাড়িটা?"

"ঠিক। ডক্টর নন্দীর ফোনসেট এখন রামেন্দুবাবুর কাছে। নন্দীর পরিচয় দিয়ে গলা পালটে ফোনটা করেন। তারপর থেকে কানেকশনটা এমনভাবে কেটে রেখেছেন, ফোন-কোম্পানি পর্যন্ত ট্রেস করতে পারছে না। মাটির তলায় অথবা কোনও ভল্টে ঢুকিয়ে রেখেছেন হয়তো। সে যাই হোক, আপাতত আমাদের কাজ হচ্ছে, লুকিয়ে রামেন্দুবাবুর বাড়ি ঢুকে ডক্টর নন্দীকে উদ্ধার করা।"

"কাজটা তো পুলিশই করতে পারত। আমাদের লুকিয়ে ঢোকার কী দরকার?" বলে ঝিনুক।

"এই যে বললাম, নাইনটি পারসেন্ট চান্স। টেন পারসেন্ট অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে। যদি ডক্টর নন্দীকে না পায় পুলিশ, আমাকে দু'কথা শুনিয়ে দেবে। একটু থেমে দীপকাকু বলেন, "অ্যাকচুয়ালি কালই আমার বোঝা উচিত ছিল, বাসনটা বিড়াল ফেলেনি, শব্দটা হয়েছিল বাসন ছোড়ার। হয়তো কিছু খেতে দেওয়া হয়েছিল ডক্টর নন্দীকে, উনি বাসনসুদ্ধু ছুড়ে ফেলে দেন। শব্দটা বারবার মনে করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।"

দীপকাকু কিছুটা যেন কল্পনার আশ্রয় নিচ্ছেন, অকাট্য যুক্তি এখনও দেননি। ঝিনুকের ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চায় না, ডক্টর নন্দী এখানেই আছেন। তবু সে জানতে চায়, "আমার এখন কী কাজ?"

স্পোর্টস ইনস্ট্রাক্টরের মতো দীপকাকু বলেন, "ভাল করে শুনে নাও, তুমি এখন গলির ধার ধরে চলে যাবে রামেন্দুবাবুর পাঁচিলের দরজায়। বেল টিপবে। কাজের লোক এসে খুলবে দরজা। তার সঙ্গে কথা চালাতে থাকবে তুমি, আমি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকে যাব ভিতরে।"

ছবিটা কল্পনা করতে গিয়ে হোঁচট খায় ঝিনুক, কী করে অত উঁচু পাঁচিল ডিঙোবেন! দীপকাকু নিঃসংশয়ে বলে যাচ্ছেন, "তুমি যতক্ষণ ধরে কথা চালাতে পারবে, আমি ততটাই সময় পাব, ভিতরটা ঘুরে দেখার।"

ঝিনুক ভেবে পায় না কাজের লোকের সঙ্গে অতক্ষণ কী কথা বলবে। জিজ্ঞেস করে, "যদি বেশিক্ষণ আটকে রাখতে না পারি?"

"তখনই দরকার পড়বে হাত-পা ছোড়ার। সে ক্ষেত্রে সামনে যদি রামেন্দুবাবুও পড়েন, দ্বিধা কোরো না।"

ঝিনুকের মুঠি আপনিই পাকিয়ে যায়, রামেন্দুবাবু তাকে অঙ্কে ঘায়েল করেছিলেন, সুযোগ এসেছে প্রতিশোধ নেওয়ার। তবে ভদ্রলোকের চেহারাটা চোখে ভেসে উঠতেই, ঝিনুকের কেমন যেন

বাধোবাধো ঠেকে, খুবই সম্ভ্রান্ত, বয়স্ক, জ্ঞানী মানুষ। এসব দিয়ে অবশ্য অপরাধের গুরুত্ব কমানো যায় না।

"কী ভাবছ! লেট্‌স গো।" দীপকাকু বুড়ো আঙুল তুলে সরে গেলেন। ভঙ্গিটাতে দারুণ স্মার্ট দেখাল। পাঁচিলটা স্মার্টলি ডিঙোতে পারলেই ভাল।

গলিতে লোকজন প্রায় নেই, ধার ঘেঁষে ঝিনুক পৌঁছে যায় দরজায়। বেল টেপার আগে দেখে নিয়েছে দীপকাকুকে, পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক ভাব করে আছেন। বেল টেপার বেশ খানিকক্ষণ পর দরজা খুলল। সামনে দাঁড়িয়ে গতকালের সেই কাজের লোক, সনাতন। পালোয়ান টাইপের চেহারাটা আজ ভাল করে মেপে নিল ঝিনুক। পারবে তো ধরাশায়ী করতে, যা ওজন। নকল হেসে ঝিনুক বলে, "চিনতে পারছ?"

সনাতন ঘাড় হেলায়। পরের কথাটা বলার আগেই ঝিনুক আড়চোখে দেখে নিয়েছে, দীপকাকুর অবিশ্বাস্য স্পটজাম্প। পাঁচিলের মাথাটা ধরে নিমেষে ভিতরে চলে গেলেন।

চোখ বড় অবস্থাতেই ঝিনুক কাজের লোককে জিজ্ঞেস করে, "আমার কাকু এসেছেন? যাঁর সঙ্গে কাল এসেছিলাম।"

"না তো!"

"সে কী, আমাকে যে আসতে বললেন।" বলে চিন্তার ভান করে ঝিনুক। ফের বলে, "তুমি শিয়োর, উনি এসে ঘুরে যাননি?"

"না না। বলছি তো কেউ আসেনি।"

আবার ভাবতে থাকে ঝিনুক। এটা ভান নয়। কথা খুঁজে পাচ্ছে না। কতক্ষণ এভাবে আটকে রাখতে পারবে কে জানে! ঝিনুক জানতে চায়, "রামেন্দুবাবু বাড়ি আছেন তো?"

"না নেই। বাবু আজ সকালেই দিল্লি চলে গিয়েছেন।"

খবরটা একটা বড় ধাক্কা। কোনওক্রমে সামলায় ঝিনুক। বলে,

"তা হলে কী হবে, জরুরি দরকারে দীপকাকু রামেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন।"

"দিন পনেরোর আগে বাবু ফিরছেন না। বলে সনাতন।

ঝিনুক ফের কথা খুঁজে বলে, "আমি এখন কী করি! ওয়েট করব কাকুর জন্য?"

"ওয়েট করে কী হবে! আপনার কাকু এলে আমি না হয় বলে দেব, আপনি বাড়ি চলে গিয়েছেন।"

কথা ফুরিয়ে আসছে। ঝিনুক বলে ওঠে, "না, একটু অপেক্ষা করেই যাই। দীপকাকু এলে একসঙ্গে ফিরব।"

"যেমন আপনার ইচ্ছে। বাড়ির ভিতরে এসেও বসতে পারেন।"

আতিথেয়তা দেখেই ঝিনুক বুঝতে পারে, পাখি উড়ে গেছে। রামেন্দুবাবু, বিপুল নন্দী দু'জনের কাউকেই পাবেন না দীপকাকু। এতক্ষণ কী করছেন তা হলে?

"কী হল, আসুন।" ডাকে সনাতন।

ঝিনুক বলে, "থাক, আমি এখানেই ওয়েট করছি।"

"ঠিক আছে।" বলে ভিতরবাড়ির দিকে ঘুরে যায় সনাতন। ঝিনুক প্রমাদ গোনে। কাজের লোকটা একটাই ভদ্রতা করছে, খোলা রেখেছে দরজা।

বাগান পেরিয়ে বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে রামেন্দুবাবুর ষণ্ডামার্কা কাজের লোক। দীপকাকুকে দেখতে পেলে, ছেড়ে কথা বলবে না। অর্থাৎ হাত-পা ছোড়ার সময় হয়ে এল।

খুবই সন্তর্পণে সনাতনকে অনুসরণ করে ঝিনুক। দালানে উঠে বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয় সনাতন। খানিকটা দৌড়োতে হয় ঝিনুককে। এ-বাড়ির একটা ঘরই ঝিনুক চেনে। কাল এসে যেখানে বসেছিল।

বাড়িতে ঢুকে আসে ঝিনুক। সনাতনকে দেখা যাচ্ছে না, দীপকাকুকে তো নয়ই। তার পরিচিত বৈঠকখানার দিকে এগোয়

ঝিনুক। দোরগোড়ায় আসতেই চমকে ওঠে! বুককেসের দিকে মুখ করে দীপকাকু বই হাতে নিয়ে পড়ছেন। সনাতন পা টিপেটিপে এগোচ্ছে দীপকাকুর দিকে। ঠিক যেন একটা টিকটিকি আরশোলা ধরতে যাচ্ছে। ঝিনুক ভেবে পায় না, এখন তার কী করা উচিত। দীপকাকুর ঘাড়ের কাছে পৌঁছে গেছে সনাতন, দু'হাত বাড়িয়েছে যেই, দীপকাকু ঘুরে গিয়ে সজোরে রদ্দা মারেন সনাতনের ঘাড়ে।

কাটা গাছের মতো মাটি নেয় রামেন্দুবাবুর কাজের লোক। পুরো অজ্ঞান, বিস্ময়ে চোখ বড়বড় হয়ে গিয়েছে ঝিনুকের, দীপকাকুর গায়ে এত জোর, জানা ছিল না তো!

হাঁটু মুড়ে বসে দীপকাকু সনাতনের শ্বাসপ্রশ্বাস, হার্টবিট, পাল্‌স পরীক্ষা করছেন। কৌতূহল দমন করতে না পেরে ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "কী করে টের পেলেন, লোকটা ধরতে আসছে?"

"বুককেসের কাচে ওর ছায়া পড়েছিল।" গম্ভীরভাবে বলেন দীপকাকু। তারপর উঠে দাঁড়ান। সনাতনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, "আধঘণ্টার আগে উঠবে না মনে হচ্ছে। আর কিছুক্ষণ যদি আটকে রাখতে পারতে, খামোখা মার খেতে হত না বেচারাকে।"

ঝিনুক মনেমনে বলে, "আপনিই বা কীরকম মানুষ। ডক্টর নন্দীকে খুঁজতে এসেছেন, না লাইব্রেরিতে ঢুকেছেন বোঝা যাচ্ছে না।"

হাতে ধরা বইটা ছাড়াও দীপকাকু আরও দুটো বই বের করে নিলেন র‍্যাক থেকে। দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন, "চলে এসো।"

বাগান ধরে দ্রুত হাঁটছেন দীপকাকু। তাল রাখতে প্রায় দৌড়োতে হচ্ছে ঝিনুককে। দীপকাকু যে ফিজিক্যালি এত ফিট, উপর থেকে বোঝা যায় না। কী জবরদস্ত রদ্দাখানা মারলেন রামেন্দুবাবুর কাজের

লোককে! ঝিনুকের গল্পের ডিটেকটিভ আদিত্য রায়কে হার মানিয়ে দেবেন দীপকাকু।

রামেন্দুবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে ঝিনুকরা। সদর পেরোনোর পর পাল্লা বন্ধ করে দিয়েছেন দীপকাকু। এখন অন্যান্য পথচারীর মতো স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটছেন। ঝিনুক বলে, "বাড়ির মধ্যে তা হলে পাওয়া গেল না কাউকে?"

"না।"

কাজের লোকটা বলছিল, "বাবু দিল্লি গিয়েছেন।"

"ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মিথ্যেই বলছে সম্ভবত।"

"কোথায় যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়?"

"এখনই বলা যাচ্ছে না। আরও কিছু ইনফর্মেশন দরকার। সেই কারণেই বইগুলো নিলাম।"

দীপকাকুর হাতে ধরা বইয়ের নাম পড়ার চেষ্টা করে ঝিনুক। ইংরেজি বই, ওড়িশা সংক্রান্ত। এই বইগুলোর কথাই দীপকাকু কাল বলেছিলেন, রামেন্দুবাবুর বিষয়ের বাইরের বই।

"বাড়ির সব ঘর দেখলেন? ওখানেই ছিলেন ডক্টর নন্দী?" জানতে চায় ঝিনুক।

"তাই তো মনে হল। একটা চোরাকুঠুরি মতো আছে। ঘরের জিনিসপত্তর দেখে বোঝা যায়, কাউকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল।"

"জিনিসপত্তর বলতে?"

"মাটিতে বিছানা, ঘরে কোনও আসবাব নেই, থালা, গ্লাস, জলের জগ, ঘুমের ট্যাবলেট, ইঞ্জেকশন।"

"ঘুমের ওষুধ কি আচ্ছন্ন রাখার জন্য?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা আসছি জেনেই কি ডক্টর নন্দীকে নিয়ে সরে পড়লেন রামেন্দুবাবু?"

"ধরে নেওয়া যায়। তবে ডক্টর নন্দীকে নিয়ে কোথাও একটা যাওয়ার কথা ছিল রামেন্দুবাবুর। আমাদের জন্য একটু আগেভাগে বেরিয়ে পড়তে হল।"

"কে খবর দিল আমরা আসছি?"

"যে অ্যালার্মের কাঁটা পাঁচটায় সেট করেছিল। রামেন্দুবাবুর সঙ্গে তার গোপন আঁতাত।"

"বুঝেছি, ডক্টর নন্দীর বাড়ির কেউ। কিন্তু কে সে?"

"কেশব। ডক্টর নন্দীর ছেলেদের কাজের লোক।"

খুবই অবাক হয় ঝিনুক। জানতে চায়, "কী করে বুঝলেন?"

গাড়ির কাছে এসে পৌঁছেছে ঝিনুকরা। দু'জনেই উঠছে না। গাড়ির মাথায় হাত রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দীপকাকু বলেন, "তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, এক্স-রে প্লেট, প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টগুলো নিয়ে আমি যখন ডক্টর নন্দীর বাড়ি থেকে বেরোলাম, সবচেয়ে কাছের ফোনবুথে ঢুকেছিলাম একবার। তখনই বুথ মালিককে বলি, আমি চলে যাওয়ার পর আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ার কারা ফোন করতে আসছে এবং কোন নম্বরে ফোন করছে টুকে রাখবেন। আমার কার্ড দেখে লোকটা কাজের গুরুত্ব বুঝেছিল। সঠিকভাবে নির্দেশ পালন করেছে। কেশবের উপর সন্দেহ আমার আগেই হয়েছিল। লালুর জিনিসপত্তর দেখতে যখন ওদের ঘরে ঢুকেছিলাম, কেশবের বেশ কিছু শৌখিন জিনিস আমার চোখে পড়ে। দামি প্যান্ট, শার্টের পিস, নামী কোম্পানির ঘড়ি, ওয়াকম্যান...নিশ্চিত হয়ে যাই কেশবের হাতে উপরি পয়সা আসছে। আমার ধারণা নির্ভুল ছিল। মিনিটদশেকের মধ্যে ওই বুথে ফোন করতে আসে কেশব। রামেন্দুবাবুর মোবাইল নম্বরে ফোন করে।"

কথা শেষ না হতেই ঝিনুক বলে ওঠে, "রামেন্দুবাবু সেলফোন

নম্বর তো আমাদের দেননি, কী করে খুঁজে পেলেন?"

"ভেরি সিম্পল, কেশব যে নম্বরে ফোন করেছিল, ফোন কোম্পানিকে বলতেই মালিকের নাম, ঠিকানা বলে দিল।"

"কেশবকে তো এখনই অ্যারেস্ট করা উচিত।" বলে ঝিনুক।

"আর-একটু পরেই হবে। রামেন্দুবাবুকে বাড়িতে যখন পেলাম না, বালিগঞ্জ থানার ওসিকে ফোন করে বলেছি অ্যারেস্ট করতে।"

"আমরা কি তা হলে এখন বালিগঞ্জ থানাতেই যাচ্ছি?" জিজ্ঞেস করে ঝিনুক।

"না, আমি এখন একবার অফিস যাব। দু'দিন খোলা হয়নি অফিস। রামেন্দুবাবুর বইগুলো অফিসে বসে পড়ে নেব।"

হঠাৎ যেন রণে ভঙ্গ দিচ্ছেন দীপকাকু। ক্যামাক স্ট্রিটের এক বহুতলের ছোট্ট ঘরে দীপকাকুর ডিটেকটিভ এজেন্সি। কোনও স্টাফ রাখার সামর্থ্য হয়নি এখনও। আগে তেমন কেসটেস আসত না, ইদানীং আসছে। এদিকে ডক্টর নন্দীর অন্তর্ধান রহস্য চলে এসেছে শেষ পর্যায়। এই সময় ঢিলে দিলেই রামেন্দুবাবু চলে যাবেন নাগালের বাইরে। দীপকাকুকে বিনীত পরামর্শ দেওয়ার ভঙ্গিতে ঝিনুক বলে, "কেশবকে একবার জেরা করলে ভাল হত না? হদিশ দিতে পারত, কোথায় যেতে পারেন রামেন্দুবাবু।"

"কেশব জানবে না। দরকারমতো কিছু কাজে লাগানো হয়েছিল ওকে। শুধু আদেশ পালন করত। আমাকেই ভেবে বের করতে হবে কোথায় ডক্টর নন্দীকে নিয়ে গেছেন রামেন্দুবাবু। মোটামুটি জায়গাটা আন্দাজ করতে পারলেই রওনা দেব।"

ঝিনুকের কল্পনায় ভেসে ওঠে রাতের মেলট্রেন, সে আর দীপকাকু বসে আছে, যে-কোনও মুহূর্তে কিছু একটা ঘটতে পারে... কল্পনা ভেঙে যায়। হাত তুলে চলন্ত ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েছেন দীপকাকু। অর্থাৎ আবার যোগাযোগহীন হয়ে যাবেন। ঝিনুকের

একটা দরকারি কথা মনে পড়ে, দীপকাকুকে পিছু ডেকে বলে, "প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টটা কার, কী পাওয়া গেল বললেন না তো?"

ঘুরে দাঁড়ান দীপকাকু, মুখে হাল্কা হাসির আভাস। বলেন, "লালুর রিপোর্ট। ওর বয়স সত্যিই একশোর উপর, প্রায় একশো পনেরো।"

এতই অবাক হয়েছে ঝিনুক, মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে না। সেই ফাঁকে দীপকাকু ট্যাক্সিতে উঠে উধাও হয়ে গেলেন।

এবারের কেসে রাতের মেলট্রেনে চড়া হল না ঝিনুকের। পরের দিন সকালে ধৌলি এক্সপ্রেস ধরে মাত্র চার ঘণ্টায় পৌঁছে গেল চাঁদিপুর।

দীপকাকু প্রায় নিশ্চিত, চাঁদিপুরের কোনও হোটেলে ডক্টর নন্দীকে তুলেছেন রামেন্দুবাবু। পুলিশের সাহায্য নিয়ে হোটেলটা খুঁজে বের করতে হবে। তারপর রামেন্দুবাবুকে অ্যারেস্ট এবং ডক্টর নন্দীকে উদ্ধার, এই হল কাজ। আজই হয়তো কলকাতায় ফেরা যাবে।

ট্রেনে আসার পথে এই কেসের অন্ধকার দিকগুলো অনেকটাই কাটিয়ে দিয়েছেন দীপকাকু। যতটুকু পড়ে আছে, আশা করা যায় আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সবটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে অটোরিকশায় উঠল ঝিনুকরা। প্রথমে যাবে লোকাল থানায়। এখানকার পুলিশ কতটা সহযোগিতা করে দেখা যাক।

ডক্টর নন্দীর গবেষণার বিষয় 'এজিং' অর্থাৎ বয়স কীভাবে থামিয়ে রাখা যায়। অবসর জীবনে বাড়িতে বসেই রিসার্চ চালাচ্ছিলেন। চাঁদিপুরে বেড়াতে এসে সৌভাগ্যক্রমে পেয়ে যান

লালুকে। যে-কোনও ভাবে হোক আন্দাজ করেন, একশো বছর পুরনো যেসব ঘটনার কথা বলছে লালু, সবই স্বচক্ষে দেখা।

লালুকে নিয়ে আসেন বাড়িতে। প্রথমে কনুই, দাঁত, মেরুদণ্ডের এক্স-রে করান, যা থেকে মানুষের বয়স বোঝা যায়। সবক'টা রিপোর্টে নির্ধারিত হয় লালুর বয়স চল্লিশের আশপাশে। বয়সের গতি কমে গেলে এমনটাই হওয়ার কথা। তা হলে কী করে বোঝা যাবে লালুর আসল বয়স?

কিছুদিন পর ডক্টর নন্দীর মাথায় আসে লালুর লিভারের কোষ পরীক্ষা করার ভাবনা। লিভারে জমা থাকে খাদ্যের সঙ্গে আসা হেভি মেটাল। যেমন সিসা।

লালুর লিভারে হেভি মেটালের ডিপোজ়িট দেখে প্রমাণ হয়, ওর বয়স একশো পনেরোর কাছাকাছি। অথচ দেখতে লাগে চল্লিশের কম। কী করে এমন হল? প্রাণিকোষে টলেমার বলে এক বস্তু আছে, যা কোষ বিভাজিত হতে সাহায্য করে। মানুষের আঠারো-উনিশ বছর বয়সের পর থেকে টলেমারের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। নতুন কোষের অভাবে বয়স্ক হতে থাকে মানুষ। পৃথিবী জুড়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে জিনকোডের অর্ডার বদলে কী করে টলেমারের ক্ষমতা বাড়ানো যায়। অন্যদিক থেকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, বাইরে থেকে কোনও কিছু শরীরে প্রয়োগ করে টলেমারকে সজীব রাখা যায় কিনা।

লালুর যে-সময় জন্ম, জিন টেকনোলজির তেমন উন্নতি হয়নি যে, জিনকোডের কারিকুরি করে বয়স থামিয়ে রাখা যাবে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটার উপর জোর দেন ডক্টর নন্দী। লালু এমন কোনও ড্রাগ নিয়েছে, যার প্রভাবে বয়স বাড়ছে খুব ধীরে। খুব ছোটবেলায় লালু চলে আসে সোনাটোলি গ্রামে। তার আগে কোথায় ছিল লালু? সেখানকার কোনও ফলমূলের গুণেই কি লালু এখনও সটান,

সতেজ! কবিরাজমশাইয়ের কাছে জানা গিয়েছে, ডক্টর নন্দীর এক্সপেরিমেন্টে হলুদ ফল একটা ভাইটাল ব্যাপার ছিল। দীপকাকু পড়াশোনা করে জানতে পারেন, হলুদ ফলের মধ্যে থাকে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, যা বয়স বৃদ্ধি রুখতে সাহায্য করে। ডক্টর নন্দীর ধারণা, ওই জাতীয় কোনও খাদ্য খেয়েছিল লালু। ওর ছেলেবেলার কথা মনে করতে বলতেন ডক্টর নন্দী। লালু আঁকত তিন পাহাড়ের ছবি, যার ওপারে ছিল সেই গ্রাম।

লালুকে নিয়ে গবেষণা চলাকালীন ডক্টর নন্দীর কলেজবেলার বন্ধু রামেন্দুবাবু উদয় হলেন। নিছক আড্ডা মারা ছিল তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য। মানুষের জিন নিয়ে কাজ করা ডক্টর রামেন্দুর চোখ এড়ায় না ডক্টর নন্দীর এক্সপেরিমেন্ট। বিষয়টা আসলে তাঁর। রিসার্চ ওয়ার্কটা আত্মসাৎ করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন।

ডক্টর নন্দীর শেষ চিঠি আসলে লালুর বলা কিছু কথা, নিয়মিত নোট নিতেন বিপুল নন্দী। নোটবুক চুরি করে রামেন্দুবাবু কিছু শব্দ কেটে দিতে লেখাটা চিঠির মতো হয়ে যায়।

রামেন্দুবাবুর উদ্দেশ্য সম্ভবত টের পেয়েছিলেন ডক্টর নন্দী, সেই কারণেই তড়িঘড়ি লালুকে পাঠিয়ে দেন গ্রামে। আমাদের চিঠি লেখেন। রামেন্দুবাবু মরিয়া হয়ে অপহরণ করেন ডক্টর নন্দীকে। ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঝিমিয়ে রেখেছিলেন, সুগারের ওষুধও দিতেন না। ডক্টর নন্দী এখন কেমন আছেন, কে জানে!

ডক্টর নন্দীকে চাঁদিপুরে নিয়ে আসার কারণ, রামেন্দুবাবু এবার বেরোবেন লালুর ছেলেবেলায় ফেলে আসা গ্রামটা খুঁজতে। যেখানে সর্বদা দিন আর আলো ঠিকরোনো গাছ এবং সেই আশ্চর্য ফল, ফুল নাকি অন্য কিছু, যা বয়সের গতি কমিয়ে দেয়!

ঝিনুকরা পৌঁছে গেল থানায়। দীপকাকু ওসির কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। জানালেন ডক্টর নন্দীর অপহরণের কথা।

ওসি ইয়ং এবং চটপটে মানুষ। দ্রুত বেশ ক'টা হোটেলে ফোন করে খবর নিলেন, দুই বৃদ্ধ বোর্ডার অমুক, অমুক নামে কোনও রুম নিয়েছে কিনা?

'সমুদ্র শোভা' নামের একটা হোটেল জানাল, গতকাল দুই বৃদ্ধ তাদের হোটেলে উঠেছেন, রামেন্দু মল্লিকের নামটা মিললেও, অপর নামটা মিলছে না। তিনি উমেশ প্যাটেল।

ওসির টেবিলের উলটো দিকে বসে থাকা ঝিনুক পাশের চেয়ারের দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "ইনি আবার কে?"

দীপকাকু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "নাম ভাঁড়িয়েছে, উমেশ প্যাটেলই হচ্ছেন ডক্টর নন্দী।"

দীপকাকুর অনুরোধে ওসি ঝিনুকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রামেন্দুবাবুকে অ্যারেস্ট করতে।

আধঘণ্টার মধ্যেই সমুদ্র শোভা হোটেলে পৌঁছে যায় ঝিনুকরা। পুলিশের জিপে করে আসার সময় ঝিনুক বহু চেষ্টা করেও কোনও বাড়ি বা হোটেলের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখতে পায়নি। ঝিনুক শুনেছে, চাঁদিপুরের সমুদ্র ভাটার টানে বেশ কয়েক মাইল পিছিয়ে যায়, জোয়ারের সময় ফিরে আসে। ভীষণ ইন্টারেস্টিং! কে জানে এবার ফুরসত হবে কিনা সমুদ্র দেখার।

হোটেলের রিসেপশনে গিয়ে দীপকাকু ডক্টর নন্দীর সেই ফোটোটা দেখালেন, ডক্টর নন্দীর অ্যালবাম থেকে যেটা খুলে নিয়েছিলেন, ফোটোয় লালুও আছে।

ফোটো দেখে রিসেপশনের ছেলেটি বলল, এরকম কোনও লোক তাদের হোটেলে ওঠেনি। রামেন্দু মল্লিকের সঙ্গে যিনি আছেন, সাদা চুল, দাড়িওলা অসুস্থ বৃদ্ধ।

ঝিনুক মুষড়ে পড়ল, দীপকাকু আশ্চর্যজনকভাবে নিজের বিশ্বাসে অটল। বললেন, "আমাদের রামেন্দু মল্লিকের ঘরে নিয়ে চলুন।"

রিসেপশনিস্ট একজন বেয়ারাকে ডেকে বলল, "এঁদের উনিশ নম্বর ঘরে নিয়ে যাও।"

রুমের সামনে এসে দরজায় টোকা মারলেন ওসি, আপনিই খুলে গেল।

ঘরে ঢুকে ঝিনুকরা থ। হাতে-পায়ে দড়ি, মুখে রুমাল বাঁধা অবস্থায় খাটে পড়ে আছেন একজন। যদি খুব ভুল না হয়, মানুষটি রামেন্দু মল্লিক।

দীপকাকুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মিলল না তাঁর আন্দাজ। ওসির নির্দেশে বেয়ারা রামেন্দুবাবুকে বন্ধনমুক্ত করে।

হাঁফাচ্ছেন রামেন্দুবাবু। অনেক কষ্টে ও সি-কে বলেন, "উমেশ প্যাটেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ট্রেনে। বয়স্ক, সজ্জন লোক, উনিও আসছিলেন বেড়াতে। আমরা দু'জনেই একাকী মানুষ, জমে গিয়েছিল খুব। হোটেলে এসে একটাই রুম নিলাম দু'জনে। তখন কি জানতাম, লোকটার উদ্দেশ্য ছিল, আমার মূল্যবান কিছু কাগজপত্তর হাতানো।"

"এত ইমপর্টেন্ট পেপারস নিয়ে আপনি বেড়াতে এসেছিলেন কেন?" ওড়িয়া ঘেঁষা বাংলায় জিজ্ঞেস করেন পুলিশ অফিসার।

রামেন্দুবাবু বলেন, "ওসব আমার রিসার্চ ওয়ার্ক। সঙ্গে থাকে সবসময়। যখন ইচ্ছে হয় কাজ করি।"

রামেন্দুবাবুর কথায় দীপকাকুর কোনও আগ্রহ নেই। অস্থির পায়চারি করছেন ঘরে। কী মনে হতে বেয়ারাকে একবার ডেকে নেন। কিছু জিজ্ঞেস করেন ফিসফিস করে।

পুলিশ অফিসার খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন রামেন্দুবাবুকে নিয়ে। জিজ্ঞেস করেন, "আপনি আমার সঙ্গে থানায় যেতে পারবেন? একটা এফ আই আর যে করতে হয়।"

কোনওরকমে বিছানা থেকে শরীর তোলেন রামেন্দুবাবু। বলেন, "চলুন।"

তখনই একবার রামেন্দুবাবুর চোখে চোখ পড়ে যায় ঝিনুকের, কেন জানি মনে হয় সারা শরীরে অসুস্থতা থাকলেও, রামেন্দুবাবুর চোখটা হাসছে। অঙ্কের ধাঁধা দেওয়ার পর যেমন হাসছিল।

রামেন্দুবাবুকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন ওসি, দীপকাকু সৌজন্য রক্ষার্থে সরিটরি চেয়ে নিলেন।

উত্তরে ও সি বললেন, "সরি তো আমারই হওয়া উচিত, আপনার কাজ করে দিতে পারলাম না। বরং আপনি আমায় হেল্‌প করলেন একজন বয়স্ক মানুষকে বাঁচাতে। এভাবে দড়ি বাঁধা অবস্থায় আর কয়েক ঘণ্টা পড়ে থাকলে অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারত।"

ঝিনুকের বুঝতে অসুবিধে হয় না, অতি মার্জিতভাবে বিদ্রুপ করে গেলেন ও সি। অপমানে ভার হয়ে আছে দীপকাকুর মুখ।

হোটেলের বাইরে পুলিশের জিপের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই দীপকাকু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেয়ারাকে বললেন, "একটা ভাড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবে ভাই?"

"এখনই দিচ্ছি।" বলে বেয়ারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঝিনুকরা চলেছে সোনাটোলি গ্রামে। এখানকার রাস্তা ঝাঁ-চকচকে। কাছেই রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র। তাই বোধহয় রাস্তার এত যত্ন।

দীপকাকুও জানেন না এই অভিযানটা কতক্ষণের অথবা কতদিনের। ট্যাঙ্ক ফুল করে তেল নেওয়া হয়েছে গাড়ির। নিজেদের জন্য শুকনো খাবার, জল সব মজুত করা হয়েছে।

দুরন্ত গতিতে চলা গাড়ির দু'পাশে অনাবিল প্রকৃতি, ছোটছোট টিলা, জঙ্গল, চাষের জমি, পুকুর... হুহু করে হাওয়া ঢুকছে জানলা

দিয়ে। প্রকৃতির রূপে এমনই মুগ্ধ হয়ে পড়েছে ঝিনুক, ভুলেই গেছে অভিযানের লক্ষ্য।

ইতিমধ্যে দীপকাকু আরও কিছু তথ্য দিয়েছেন, এই আদিবাসী অঞ্চলে একসময় ওয়াংগ নামে এক গোষ্ঠী বসবাস করত। অনুর্বর জমি, জমিদারদের অত্যাচার, অসহ্য হয়ে উঠেছিল তাদের কাছে। এসব ১৯০০ সালের গোড়ার কথা, ওই গোষ্ঠীতে ধুনিরাম নামে একটি ভবঘুরে লোক ছিল। সে একবার পাহাড়ের ওপার থেকে ঘুরে এসে খবর দিল এমন একটা জায়গার, যেখানে ভগবান থাকেন, সেখানে কোনও কষ্ট নেই, অত্যাচারও নেই, অজস্র ফল, ফুল, সেখানে সর্বদা দিন। ধুনিরামের কথা গোষ্ঠীর লোক প্রথমে বিশ্বাস করেনি। ওই গোষ্ঠীর এক মহিলার একদিন ভর হল। ঘোর অবস্থায় উনি জানালেন, ধুনিরামের ঘুরে আসা জায়গাটা তিনি দেখতে পাচ্ছেন। ধুনিরাম যা বলেছে সব সত্যি।

দীপকাকু এত দূর এসে মন্তব্য করেছেন, ভর হওয়া বলতে লোকে বোঝে ভূতে পাওয়া। আসলে এক ধরনের মনোরোগ। দুঃখ, কষ্টে জর্জরিত মহিলার মনে ধুনিরামের বর্ণনা প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছিল।

গোষ্ঠীর মাতব্বররা ঠিক করে ধুনিরামকে সামনে রেখে তারা ওই উপত্যকায় যাবে। নিজেদের জমি, বসত ফেলে রেখে পুরো গোষ্ঠীটাই চলে যায় পাহাড়ের ওপারে। তারপর সেই জাতির আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ...দীপকাকু এসব জানতে পেরেছেন রামেন্দুবাবুর বাড়ি থেকে নেওয়া বইগুলো পড়ে। দীপকাকুর ধারণা লুলারাম, ধুনিরামদের কেউ। ওয়াংগ গোষ্ঠীর শেষ প্রতিনিধি। যে ফিরে এসেছিল পাহাড়ের এপারে। খুব ছেলেবেলায়, সঙ্গে হয়তো বাবা ছিলেন। তিনি মারা গিয়েছেন।

সব শুনে ঝিনুক বলেছিল, "আপনি যাই বলুন, একশো পনেরো

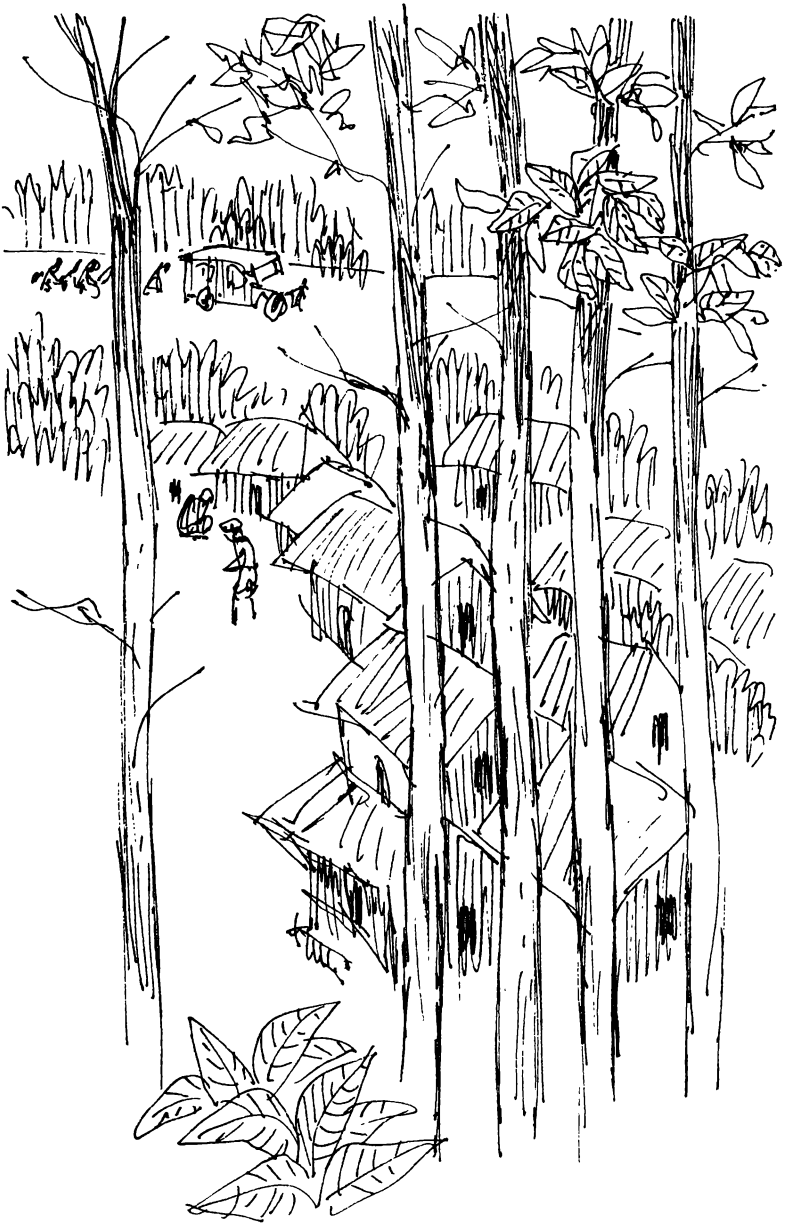

বছর বাঁচাটা আমার কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছে। তারপর আবার লোকটা নাকি খুবই ইয়ং।"

দীপকাকু বলেছেন, "খুব-একটা অসম্ভব কিছু নয়। উজবেকিস্তান, ইজ়রায়েল এরকম বেশ কয়েকটা দেশের মানুষ আশি, নব্বই বছর অনায়াসে বাঁচে। কারণ তাদের ফুড হ্যাবিট এবং ক্লাইমেট।"

ঝিনুক আর কোনও তর্কে যায়নি। কেসটা নিয়ে সে এখন মাথা ঘামাচ্ছে না। এই সুযোগে বেড়িয়ে নিতে পেরে তার বেশ ভালই লাগছে।

সোনাটোলিতে পৌঁছে গেল ঝিনুকরা। পাথুরে জমি, শাল-সেগুনের মাঝে পরিচ্ছন্ন একটি আদিবাসী গ্রাম। গাড়ি ঢুকতে দেখে দৌড়ে এল কচিকাঁচার দল এবং কিছু কৌতূহলী মানুষ। দীপকাকু মোড়লের খোঁজ করলেন। ঝিনুকদের ঘিরে থাকা মানুষগুলো নিয়ে গেল মোড়লের বাড়ি।

উঠোনে দড়ির খাটিয়ায় বসতে দেওয়া হল ঝিনুকদের। বৃদ্ধ মোড়ল এলেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, লুলারাম বেশ কিছুদিন হল গ্রামে ফিরেছে। কাল দুই বাবু এসেছিলেন, লুলারামের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁদের মধ্যে সাদা চুল, দাড়িওলা বাবু আজ সকালে এসে, লুলারামকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন কোথায়, কেউ জানে না।

"তিন মাথা পাহাড় কোন দিকে?" জানতে চান দীপকাকু। কেউ কিছু বলতে পারে না। একে অপরের মুখের দিকে তাকায়। আশা ছেড়ে দীপকাকু বলেন, "আজ ওরা কোন রাস্তায় গিয়েছে?"

গ্রামের দু'-একজন হাত তুলে দিকনির্দেশ করে। একটুও সময়

নষ্ট না করে গাড়ি লক্ষ করে এগিয়ে যান দীপকাকু। কথাবার্তার ফাঁকে ঝিনুক গ্রামের বাচ্চাদের নিজেদের জন্য নেওয়া বিস্কুট, লজেন্স কিছুটা বিলিয়ে দিয়েছে। গাড়ি ছাড়তেই লজেন্স-ভরা হাতে বাচ্চাগুলো টা-টা করে।

রাস্তা আর আগের মতো ভাল নয়। লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে গাড়ি। দু'পাশে জঙ্গলের ঘনত্ব বাড়ছে। ড্রাইভারটি ভাল পাওয়া গিয়েছে, এরকম অনির্দিষ্ট যাত্রায় একটুও বিরক্ত হচ্ছে না।

ঝিনুক হচ্ছে। কাঁহাতক আর গাড়িতে বসে থাকা যায়! কোমর ধরে যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে চারপাশটা ঘুরে দেখলে হত। সামান্য অসহিষ্ণু কণ্ঠে ঝিনুক বলে ওঠে, "সবাই বলছে, 'সাদা চুল, দাড়িওলা লোক', আপনি কী সূত্রে ধরে নিচ্ছেন, ওই মানুষটাই ডক্টর নন্দী?"

সামনের দিকে তাকিয়ে থেকে দীপকাকু বলেন, "হোটেলের বেয়ারাকে একফাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনিশ নম্বর রুমে একটা চিনি ছাড়া চা যেত কিনা? সে বলেছে, যেত।"

ঝিনুকের খেয়াল হয়, "ডক্টর নন্দী সুগারের পেশেন্ট। দীপকাকু ভাল বুদ্ধি খাটিয়েছেন তো! কিন্তু এতে সাদা চুল দাড়ির রহস্য পুরোপুরি মিটল না। প্রশ্নটা করে ঝিনুক। দীপকাকু বলেন, "যতদূর মনে হচ্ছে ডক্টর নন্দীর চুল, দাড়ি সাদাই, কলপ করতেন। এই ক'দিন চুল, দাড়ির কোনও পরিচর্যা হয়নি, তাই এ অবস্থা।"

সম্ভবনাটা বাতিল করা যায় না। পরক্ষণেই ঝিনুকের মাথায় আসে আর-একটা পয়েন্ট। জিজ্ঞেস করে, "ডক্টর নন্দীর পক্ষে কি সম্ভব, রামেন্দুবাবুকে ওভাবে পিছমোড়া করে বাঁধা? হোটেলের লোক যখন বলছে, ওঁকে খুব অসুস্থ লাগছিল।"

"রামেন্দুবাবুকে বেঁধেছে লালু। শুনলে না, মোড়ল বলল, গতকাল দুই বৃদ্ধ এসেছিল লালুর সঙ্গে দেখা করতে। সেই সময় সুযোগ বুঝে লালুকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন ডক্টর নন্দী। হোটেলের নাম, রুম নম্বর সব বলে দেন। লালু তার মালিকের আজ্ঞা পালন করে।"

"কাল লালুর কাছে ওঁরা কেন এসেছিলেন?"

"লালুকে সঙ্গে নিয়ে তিন পাহাড়টা খুঁজতে যাবেন, ঠিক করতে এসেছিলেন টুর প্রোগ্রাম।"

"ডক্টর নন্দী কেন রামেন্দুবাবুকে চেনালেন লালুর গ্রাম?"

"উনি নিরুপায়, একা কিছু করতে পারছেন না। লালুর সঙ্গে দেখা হলে, সাহায্য পেতে পারেন, সেই আশায় এসেছিলেন।"

ঝিনুক এবার চুপ করে যায়, দীপকাকুর চিন্তাভাবনার নাগাল পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। একদিন ঠিক বিদেশ থেকে বড় কোনও ডিটেকটিভ এজেন্সি দীপকাকুকে বিশাল টাকার অফার দিয়ে নিয়ে চলে যাবে। ঝিনুকের কোনও সুযোগই হবে না দীপকাকুর সঙ্গে লেগে থাকার। এসব ভাবতে ভাবতে আর-একটা কথা মাথায় আসে ঝিনুকের। দীপকাকুকে বলে, "আচ্ছা, তিনমাথা পাহাড়ের হদিশ তো কেউ দিতে পারছে না। ডক্টর নন্দী তা হলে লালুকে নিয়ে গেলেন কোথায়?"

উত্তর আসছে না দীপকাকুর কাছ থেকে। হয়তো আর কোনও প্রশ্ন শোনার ইচ্ছে নেই। ড্রাইভারকে বললেন, গান চালাতে।

ড্রাইভার বলল, তার কাছে সব ওড়িয়া গানের ক্যাসেট।

"তাই চালাও।" বলে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকলেন দীপকাকু।

গান শুরু হল। কথা পুরোপুরি না বুঝলেও সুরটা বেশ ভাল লাগে ঝিনুকের।

এভাবে কতটা পথ চলা হল, কে জানে! হাওয়া আর আগের মতো আরামদায়ক নেই। রোদও উঠেছে বেশ। একটু খিদেখিদে পেতে, ঝিনুক ঘড়ি দ্যাখে, দুপুর একটা! দীপকাকুকে বলতে যাবে, এবার লাঞ্চটা সেরে নিলে হত। ...তার আগেই দীপকাকু জানলার বাইরে হাত তুলে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেন, "ওটা কী ফ্যাক্টরি?"

দীপকাকুর আঙুল বরাবর তাকিয়ে ড্রাইভার বলে, "স্টিল প্ল্যান্ট।"

"ওখানে যারা কাজ করে, কোথা থেকে আসে?"

"অফিসাররা কোয়ার্টারে থাকেন। লেবাররা আশপাশের গ্রামের।"

"কতদিন হল ফ্যাক্টরিটা হয়েছে?"

"অনেক পুরনো দিনের কারখানা। সেই ইংরেজ আমলের। পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে।"

"কী?" দীপকাকু ফের শুনতে চান কথাটা।

ড্রাইভার রিপিট করে। সঙ্গে যোগ করে, "ওই কারখানা তৈরি হওয়ার গল্প আমি ঠাকুরদার মুখে শুনেছি।"

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গাড়ি দাঁড় করাতে বলেন দীপকাকু। বিশেষ কিছু একটা চোখে পড়েছে।

গাড়ি দাঁড়ায়। ঝিনুক কৌতূহলী গলায় জানতে চায়, "কী হল?"

গাড়ি থেকে নামলেন না দীপকাকু, আঙুল তুলে বলেন, "ওই দ্যাখো!"

ঝিনুক প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারে না। টিলা, জঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখার নেই। যা এতক্ষণ ধরে দেখে এসেছে। খুঁটিয়ে লক্ষ করতে গিয়ে টের পায়, দীপকাকু আসলে কী দেখাচ্ছেন। স্টিল প্ল্যান্টের পাশে দুটো ছোটছোট টিলা।

দীপকাকু পাশ থেকে বলেন, "তিন মাথাওলা পাহাড়। একটা পাহাড় ভেঙে ফ্যাক্টরি হয়েছে।"

আরও ঘণ্টাখানেক গাড়ি চলার পর, ঝিনুকরা পৌঁছোল পাহাড় আর স্টিলপ্ল্যান্টের পিছনে। নির্জন বনাঞ্চল। খিদের কথা ভুলেই গিয়েছে ঝিনুক। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের অভিযান সম্পূর্ণ হবে।

এ-জঙ্গলে পথ বের করা বেশ কঠিন, ড্রাইভার সবে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, এবার বোধহয় হেঁটেই যেতে হবে। তখনই চোখে পড়ে সামনে আর-একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে ড্রাইভারের পা। বোধহয় ঘুমোচ্ছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দীপকাকু বলেন, "মনে তো হচ্ছে ডক্টর নন্দীর গাড়ি।"

ঝিনুকদের ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করায়। তিনজনেই নেমে আসে গাড়ি থেকে। ঘুম ভেঙেছে সামনের গাড়ির ড্রাইভারের। খুবই বিরক্ত। ঝিনুকদের ড্রাইভারের সঙ্গে ওড়িয়া ভাষায় কথা বলে সে। যতটুকু বোঝা গেল, তার দুই প্যাসেঞ্জার একজন বুড়ো, অপরজন জোয়ান ,গিয়েছে নীচের জঙ্গলে। বলেছিল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবে, আড়াই ঘণ্টা হতে চলল, ফেরার নাম নেই। আর কিছুক্ষণ দেখে সে এবার ফিরে যাবে।

দীপকাকু ড্রাইভারটিকে নিরস্ত করেন। বলেন, "তোমরা দু'জনে মিলে গল্প করো, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের নিয়ে আসছি। আমাকে শুধু দেখিয়ে দাও, তোমার প্যাসেঞ্জাররা কোনদিকে গিয়েছে।"

অপর গাড়ির ড্রাইভার খানিকটা এগিয়ে ঢালুর সামনে দাঁড়ায়।

তারপর আঙুল তোলে। দীপকাকু পকেট থেকে বের করেন তাঁর সেই অসাধারণ বাইনোকুলার। দেখতে ছোট, রেঞ্জ সাংঘাতিক।

চোখে দূরবিন লাগিয়ে নীচের জঙ্গল, উপত্যকা খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন দীপকাকু। ঝিনুক খালি চোখেই দেখতে পায়, দূরে মাঠমতো জায়গায় একটা পোড়োবাড়ি, অনেকটা চার্চ টাইপের। ঝিনুক বলে, "বাড়িটা দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, আমাদের গন্তব্য এখন ওখানেই। খাবারের ব্যাগ আর জলটা নিয়ে নাও।" বলেন দীপকাকু।

অনেকটা ঢালু বেয়ে, ঝোপঝাড় মাড়িয়ে, বুনো গাছপালার গন্ধ গায়ে নিয়ে ঝিনুকরা এখন চার্চবাড়ির সামনে। বাড়িটার ভগ্নদশা বললে কম বলা হয়। আশ্চর্যভাবে দাঁড়িয়ে আছে!

দুপুরবেলা বলে ঝিনুক তবু ঢুকতে সাহস পাচ্ছে, দীপকাকু সঙ্গে থাকলেও, রাতের বেলায় ঢুকতে পারত না।

প্রেয়ারের ঘরটায় এসে চোখ যায় জানলায়, এক প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছেন। ঝিনুকদের দিকে তাঁর পিঠ।

দীপকাকু বলে ওঠেন, "ডক্টর নন্দী!"

শব্দের প্রতিধ্বনি হয়। ঘুরে দাঁড়ান ভদ্রলোক, ধবধবে সাদা চুল, দাড়ি। ফোটোয় দেখা বিপুল নন্দীর সঙ্গে মেলানো মুশকিল।

দীপকাকু ফের বলেন, "আমি দীপঙ্কর বাগচী। আপনি আমাকে..."

কথার মাঝে ডক্টর নন্দী বলে ওঠেন, "কনগ্র্যাচুলেশন। আপনার কাজে আপনি সফল। আমি কিন্তু ব্যর্থ।"

"কেন?"

"যে-গাছের খোঁজে এখানে এসেছিলাম, তা নেই।"

"ছিল কি কোনওদিন?" জানতে চান দীপকাকু।

"অবশ্যই ছিল। তার যথেষ্ট প্রমাণ এখনও এই প্রাকৃতিক পরিবেশে ছড়িয়ে আছে।"

কথার ফাঁকে ঝিনুক জানতে চায়, "লালু, মানে লালুদা কোথায়?"

"আছে আশপাশে। ওর খুব মন খারাপ। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।" বলে ডক্টর নন্দী দীপকাকুর উদ্দেশে বলেন, "লালুর বয়সটা নিশ্চয়ই বের করে ফেলেছেন, কী করে এতদিন জরা, ব্যাধি ঠেকিয়ে বেঁচে আছে, তা কি জানেন?"

গাড়িতে আসতে আসতে ঝিনুককে যতটুকু বলেছিলেন দীপকাকু, সেটাই খুব সংক্ষেপে বলেন। একই সঙ্গে জানতে চান, "আমার তিনটে বিষয়ে খুব খটকা আছে, ওরা যাকে ভগবান বলত, তিনি আসলে কে? আর গাছ থেকে আলো ঠিকরোনো কি সত্যিই সম্ভব? তিন, সর্বদা দিন বলতে কী বোঝাতে চাইত লালু?"

স্মিত হাসেন বিপুল নন্দী। বলেন, "ভগবান নন, খুব বড় মাপের কোনও উদ্ভিদবিজ্ঞানী। এখানে এসে ডেরা বেঁধেছিলেন। এই বাড়িটা তাঁর। অবশ্যই সাহেব, তাই চার্চ কাম বাড়ি। তিনিই ওই আশ্চর্য গাছের আবিষ্কর্তা অথবা সৃষ্টিকর্তা। সে গাছের ফল, ফুল, পাতা অথবা শিকড়ের নির্যাস প্রয়োগ করে মানুষের বয়স আটকে রাখা যেত।"

"গাছগুলো গেল কোথায়?" জানতে চান দীপকাকু।

ডক্টর নন্দী বলেন, "ভূমিকম্প, প্লাবন, দাবানল কোনও না-কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ওয়াংগ জাতি পর্যন্ত। কেউ একজন লুলারামকে নিয়ে পালাতে সমর্থ হয়েছিল। লুলারামের শরীরে ততদিনে প্রয়োগ হয়েছে সেই গাছের নির্যাস, যার প্রভাবে আজও সে সজীব।" একটু দম নেন ডক্টর নন্দী।

তারপর বলেন, "এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিই, আলো ঠিকরোনো গাছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অসম্ভব। তবে প্রকৃতির রহস্য ভেদ করা বড় কঠিন। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে, সাহেববিজ্ঞানী অত বছর আগে সোলার এনার্জি কাজে লাগিয়ে এলাকাটা আলোকিত রাখতেন। তার ভাঙা সরঞ্জাম আমি চার্চে পেয়েছি। ভুল বিশ্বাসে হলেও, ওয়াংগ জাতি এখানে চাষবাস করে ভালই ছিল। বিজ্ঞানী ওদের শরীরের উপর 'এজিং'-এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাতেন। সফলও হয়েছেন।"

"আমার একটা প্রশ্ন আছে?" বলে ওঠে ঝিনুক।

"নিশ্চয়ই, বলো।" বলেন ডক্টর নন্দী।

"আপনার চুল, দাড়ি এমন সাদা হল কী করে! ফোটোয় তো..."

প্রশ্ন শেষ করার আগেই বিপুল নন্দী অনুযোগের সুরে বলেন, "আর বোলো না, রামেন্দুটা এত বদমাইশ, আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখত, কখন এক ফাঁকে চুল, দাড়িতে সাদা কলপ করে দিয়েছে।"

এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে এখনই হেসে ফেলত ঝিনুক, চোখ ঘুরিয়ে নেয় জানলার দিকে, দেখে, বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি একজন মানুষ ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সামনের জমি দিয়ে।

ঝিনুক আঙুল তুলে জানতে চায়, "ওই কি লালুদা?"

ডক্টর নন্দী বলেন, "হ্যাঁ। ওর কলকাতায় ফেরার ইচ্ছে নেই। আমাকে অপহরণ করার আগে ওকে দু'বার চেষ্টা করা হয়েছিল। তখনই লালুকে গ্রামে পাঠিয়ে দিই এবং তোমাদের চিঠি লিখি। সোনাটোলি গ্রামেও লালুর মন টিকছে না। এখানেই থেকে যেতে চায়। ওকে একা এই উপত্যকায় ফেলে যাই কী করে!"

দীপকাকু বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করেন, "লোকটা সময় আর স্মৃতির ভারে ক্লান্ত। কী লাভ এই দীর্ঘ জীবনের!"

দীপকাকুর দার্শনিকতায় ঘাবড়ে যায় ঝিনুক, মানুষটার হল কী। এটাও কি পরিবেশের গুণ?

লালু এসে দাঁড়ায় চার্চের দরজায়। মাথা নিচু করে আছে। ডক্টর নন্দী বলেন, "চল, এবার ফিরি।"

মাথা নাড়ে লালু। অর্থাৎ যাবে না। পরিস্থিতির অচল অবস্থা কাটাতে ঝিনুক এগিয়ে যায় লালুর কাছে। বোঝানোর ভঙ্গিতে বলে, "অনির্বাণের খুব মন খারাপ, তুমি নেই বলে। অনির্বাণ কে বুঝতে পারছ তো লালুদা?"

মাথা হেলায় লালু। অস্ফুটে বলে, "অনিদাদা!"

ঝিনুক দ্বিগুণ উৎসাহে বলে, "চন্দনাটাও রাতদিন 'কে এল রে লালু, কে এল রে লালু...বলে ডেকে যাচ্ছে।"

লালুর মুখে হাসি ছড়ায়, বয়স আরও যেন কমে যেতে থাকে।

•

দুপুরে খাওয়াদাওয়া চার্চেই হল। বিকেল গড়াতেই বেরিয়ে পড়ল ঝিনুকরা। লালু এখন আগে আগে হাঁটছে, ওরই যেন কলকাতায় যাওয়ার তাড়া বেশি।

ঢাল বেয়ে অনেকটা উঠে এসেছে ঝিনুকরা। ছোট্ট চাতালে এসে দম নেয়। কী মনে হতে ঝিনুক একবার পিছন ফিরে দ্যাখে। সঙ্গেসঙ্গে শিহরিত হয়। ফেলে আসা উপত্যকায় এখন শেষবেলার আলো। প্রতিটি গাছ যেন জ্বলছে। আলোজ্বলা গাছ!

আর-একটু হলে দীপকাকুকে ডেকে ফেলতে যাচ্ছিল ঝিনুক, সামলায় নিজেকে। ডক্টর নন্দী বলেছিলেন, 'প্রকৃতির রহস্য ভেদ করা বড় কঠিন।' এইমাত্র প্রকৃতির আশ্চর্য রহস্য ভেদ করেছে ঝিনুক। এই আনন্দ, এই সাফল্য তার একার। সে কারও সঙ্গে ভাগ করবে না।

———